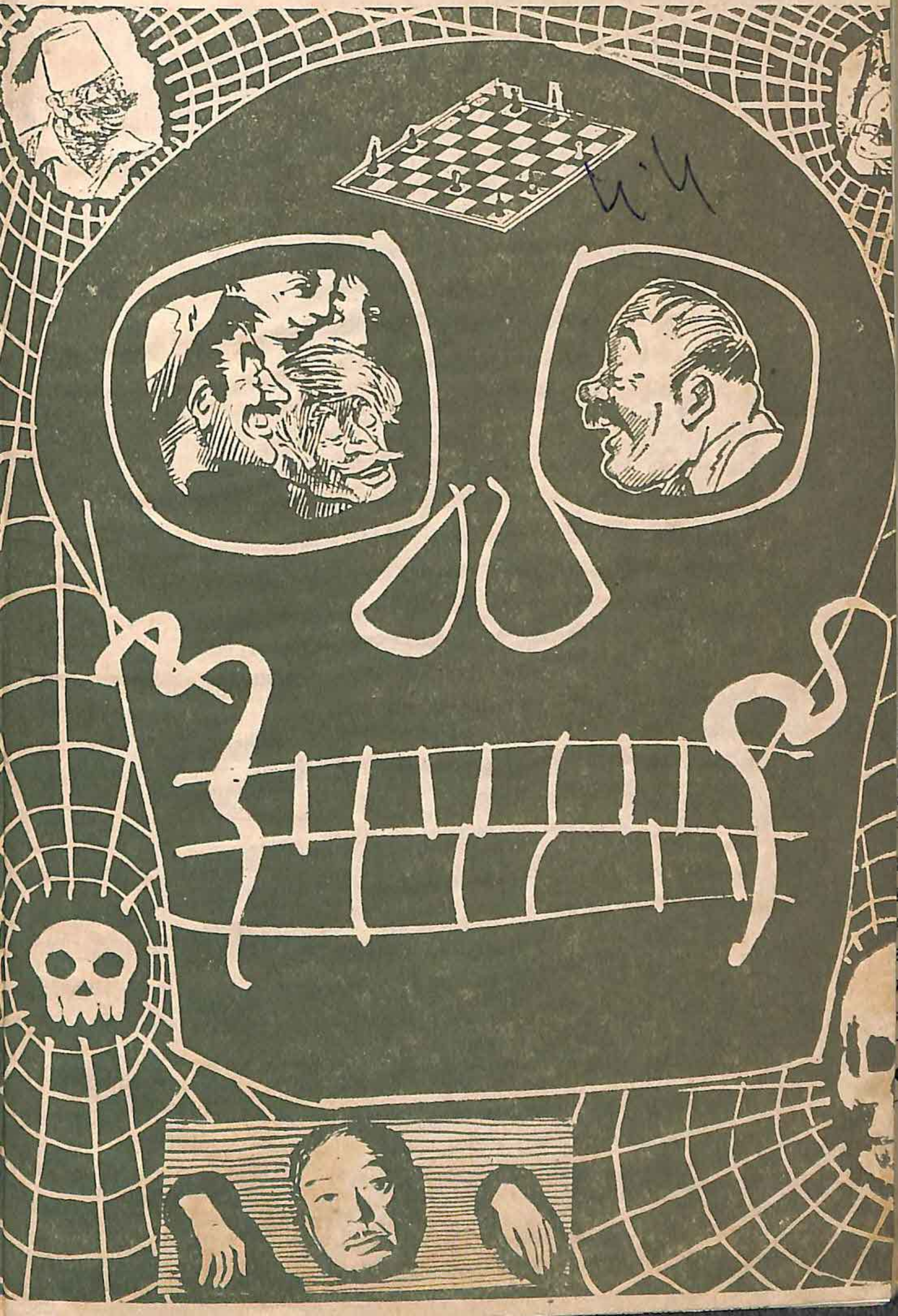


রাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ





পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ

রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড্ ইন এইট্টি ডেজ

জুলে ভার্নে

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা
অনুদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০


উপহার



ফগ, ফিক্স, পাসেপার্তু সকলেই গুলি চালাচ্ছে।

রাউণ্ড দি ওয়াল্ড্ ইন এইট্টি ডেজ

(১)

১৮৭২।

সালটা মনে রাখতে হবে। তা না হলে ফিলিয়াস ফগ-এর এই চমকপ্রদ কাহিনী কাউকেই বড় একটা চমক দিতে পারবে না। কাউকে অর্থাৎ এ-যুগের কাউকে।

মনে রাখতে হবে যে ১৮৭২ সালে জেট প্লেন তো আবিষ্কৃতই হয় নি, সামুদ্রিক যানগুলিও খুব উন্নতশ্রেণীর ছিল না এবং মহাদেশগুলির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথও কোথাও তৈরী হয় নি, একমাত্র আমেরিকায় ছাড়া। ভারতবর্ষে একটা রেলের লাইন খুলেছে— শুনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে লাইনে কোথা থেকে কোথায় যাওয়া যায়—সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কারোই নেই।

ফিলিয়াস ফগ লণ্ডনে থাকে—বার্লিংটন গার্ডেন অঞ্চলে সাত নম্বর স্যাভাইল রো'তে। এই বাড়িতেই ষাট বছর আগে বাস করতেন বিখ্যাত নাট্যকার, বিখ্যাত বাগ্মী, প্রথম শ্রেণীর পার্লামেণ্ট-সভ্য শেরিডান। কাজেই বাড়িটা অভিজাত শ্রেণীর বাসোপযোগী, তাতে সন্দেহ নেই।

এই বাড়িতে একা থাকে ফিলিয়াস একটি মাত্র চাকর নিয়ে। বিবাহ কোন দিন করেছে বলে কেউ শোনে নি। বয়স চল্লিশের ওপরে, সুস্থ সবল দীর্ঘদেহ, শৌখীন সুবেশ, কাঁটায় কাঁটায় নিয়মনিষ্ঠ। সে-নিষ্ঠা এতই প্রবল যে তারই খাতিরে সম্প্রতি একমাত্র ভৃত্য জেমস ফস্টারকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছে ফিলিয়াস। অপরাধ? হ্যাঁ, অপরাধ তার ছিল বই কি! প্রত্যহ ছিয়াশি ডিগ্রী গরম জলে দাড়ি কামানো অভ্যাস ফিলিয়াসের, সেদিন হতভাগা ফস্টার কি না চুরাশি ডিগ্রীর জল নিয়ে এল?

*　　*　　*

বেলা এগারোটা থেকে বসে আছে ফিলিয়াস। নতুন একজন চাকর আসবে কথা আছে। ফস্টারের নোটিস পেরিয়ে যাচ্ছে আজ বেলা বারোটায়। তার আগে অন্য লোক না এলে মুশকিল। এগারো থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে নতুন লোকটির আসবার কথা আছে। দেরি

করলে দেখা হবে না, দেখা হয়েও লাভ নেই, কারণ কথামত হাজির হতে যে অক্ষম, তাকে ফিলিয়াস ফগ চাকরিতে বহাল করবে না কখনও।

দেরি করলে দেখা হবে না, কারণ ঠিক সাড়ে এগারোটায় বেরিয়ে যাবে ফিলিয়াস। রোজই যায়। রিফর্ম ক্লাবের সদস্য সে, যায় সেখানে। সেখানে গিয়ে তবে প্রাতরাশ খাবে। তারপর লাঞ্চ খাওয়া, ডিনার খাওয়া যথাসময়ে সব খাওয়াই ক্লাবে সমাধা করবে। ঠিক দুপুররাত্রে বাড়ি ফেরে ফিলিয়াস। সাড়ে এগারো ঘণ্টা বাড়িতে থাকে। বেশির ভাগ সময়টা ঘুমিয়ে কাটায়, বাকীটা কাটে সাজপোশাকে এবং প্রাতঃকালীন চা-পানে, এবং বৈঠকখানার মোজেইক-করা মেজেতে বা ছাদের কুড়িটা গ্রীক থামওয়ালা গম্বুজের নীচে পায়চারিতে।

ফিলিয়াস চেয়ারে বসে আছে, ঘড়ির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে, এগারোটা কুড়ি। লোকটা যদি দশ মিনিটের ভেতর না পৌঁছায়, তার মত লোককে নেবে না ফিলিয়াস। এগারোটা পঁচিশ। হাতে দস্তানা পরছে ফিলিয়াস। তিন মিনিট সময় আর, দুই মিনিট, এক মিনিট!

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে ফিলিয়াস এমন সময় ঘণ্টা বাজল সদরে। ফস্টার গেল দেখতে। ফিলিয়াস বসল আবার।

টং করে সাড়ে এগারোটা বাজল। ফস্টার এসে খবর দিল—"নতুন ভৃত্য এসেছে।"

তার পেছনে পেছনে এসে নমস্কার করল বছর ত্রিশ বয়সের এক যুবক।

"তোমার বাড়ি ফরাসী দেশে? আর তোমার নাম জন?"—জিজ্ঞাসা করল ফিলিয়াস।

"জন?"—আগন্তুকের মুখে যেন তুবড়ি ছুটতে লাগল এই সামান্য জিজ্ঞাসাতেই—"জন? না হুজুর, আপনি কিছু মনে করবেন না—আমার নাম হচ্ছে জাঁ। জাঁ পাসেপার্তু। আপনি অবশ্য জানেন—নামটার, মানে ওই দ্বিতীয় নামটার অর্থ তত ভাল নয়। যে ঘন ঘন ব্যবসা বদলায়, তাকেই পাসেপার্তু বলে লোকে। তা আমার ক্ষেত্রে নামটা সার্থক হয়েছে মালিক। এক কাজ ছেড়ে আর এক কাজ পাকড়ানো আমার কাছে ও যেন এক জামা খুলে ফেলে অন্য জামা গায়ে চড়ানোর মতই সোজা। কী আমি করি নি? ভবঘুরে কীর্তনে, সার্কাস খেলোয়াড়, কুস্তির ওস্তাদ, তারপর মশাই ফায়ারম্যান সর্দার। তবে ফরাসীদেশ

ছেড়েছি আজ পাঁচ বছর হল, এখানে এসে বড় বড় লোকের খাস খানসামার কাজ করেছি কয়েকটা তা সে সব মনিবের সঙ্গে ঠিক খাপ খেলো না হুজুর, প্রায় সবাই—কিছু মনে করবেন না—উড়নচণ্ডে ধরনের লোক। এমন সময় শুনলাম ইংলণ্ডের সবচেয়ে নিয়মনিষ্ঠ ভদ্রলোক হচ্ছেন মাননীয় ফিলিয়াস ফগ মশাই, এবং তাঁরই একজন খানসামার দরকার হচ্ছে এই মুহূর্তে। অমনি ভাবলাম—ওঁর কাছে যদি চাকরি পাই, শান্তিতে থাকব, পাসেপার্তু নামটাকে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারব এত কাল পরে।"

ফিলিয়াস ধৈর্য ধরে সব শুনল বটে, কিন্তু জবাব দিল এক কথায়—"তোমার সুপারিশ ভাল আছে। আমার এখানে কী কাজ করতে হবে, কত মাইনে পাবে—সব জান তো ?"

"আজ্ঞে, জানি—"

"ঠিক আছে। তা হলে আজ ১৮৭২ সালের ২রা অক্টোবর বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে তুমি আমার কাজে নিযুক্ত হলে।"

বলতে বলতে টুপি হাতে নিয়ে ফিলিয়াস উঠল এবং সেই টুপি মাথায় পরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেল দ্বিতীয় বাক্যটি ব্যয় না করে।

পাসেপার্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল—সদর দরজা প্রথমে খুলে গেল, তারপর বন্ধ হল। অর্থাৎ বেরিয়ে গেলেন তার মনিব। তারপর সদর দরজা আবার খুলে গেল, আবারও বন্ধ হল। এবার বেরিয়ে গেল আগেকার ভৃত্য জেমস ফস্টার। স্যাভাইল রো'র বাড়িতে পাসেপার্তু নিছক একা।

পাসেপার্তু বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সুন্দর বাড়ি, সাজানো বাড়ি, কেতাদুরস্ত বাড়ি। তার নিজের ঘর যে কোন্‌টা তা চিনে নিতে কোন অসুবিধাই হল না। চমৎকার ঘর। বড় ঘড়ি একটা। নীচের ঘরের ঘড়ির সঙ্গে এক চুল সময়ের তফাত নেই এর। ঘড়ির নীচে একটা কার্যতালিকা। রাত দুপুর থেকে পরদিন বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কখন কী করতে হবে তার ফিরিস্তি। মিনিট সেকেণ্ড হিসাব করে লেখা রয়েছে। দুপুর রাতে ফিলিয়াস বাড়ি ফেরে, তার আগে কোন কাজ নেই, বেলা সাড়ে এগারোটায় ফিলিয়াস বেরিয়ে যায় কাজ নেই তার পরেও।

পাসেপার্তু নিজের ভাগ্যের তারিফ করল বার বার। "এইবার পরম শান্তিতে কাটাতে পারব। ফগ সাহেবের সঙ্গে আমার বনবে, নিশ্চয় বনবে।

খেয়ালী নয়, উড়নচণ্ডে নয়। সময়ের ঠিক আছে, কথার ঠিক আছে, চমৎকার মানুষ।"

* * *

ফিলিয়াস ফগ স্যাভাইল রো থেকে বেরুলো সাড়ে এগারোটায়। আগে ডান পা, তার পরে বাঁ পা—এইরকম পা ফেলল পাঁচশো পঁচাত্তর বার। তারপর আগে বাঁ পা, পরে ডান পা, এইরকমে ফেলল পাঁচশো ছিয়াত্তর বার। নিত্য এই এতবারই ফেলে থাকে সে। এতবার ফেললেই সে পৌঁছে যায় রিফর্ম ক্লাবে। বিরাট প্রাসাদ এই ক্লাবের, পল্ মলের সব সেরা অংশে ত্রিশটি লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে এই প্রাসাদ তৈরী হয়েছে।

দেশের মাথা-মাথা লোক সদস্য এই ক্লাবের। ব্যাঙ্ক মালিক ফ্যালেটিন আর সালিভান, মদ চোলাইওয়ালা ফ্লানাগান, গথিয়ার র‍্যাল্ফ্—ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর,—এই রকম সব বড় বড় ব্যবসার মালিক আর পরিচালক। এদের ভেতর ফিলিয়াস ফগই নাম-গোত্রহীন। ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু তার নেই, না ডাক্তার, না এঞ্জিনিয়ার, না ব্যারিস্টার, না কিছু। ওর কোন কারখানা নেই, কোন আবাদ নেই, নেই খনি বা জাহাজ কোম্পানি।

তবে হংসমধ্যে বকো যথা ফিলিয়াস ফগ এই ধনকুবের-সমাজে ঠাঁই পেল কী করে ?

পেল ব্যাঙ্কার বেরিং ব্রাদার্সের সুপারিশে। ফিলিয়াসের ধনদৌলত যা কিছু, তা ওদেরই কাছে গচ্ছিত আছে।

ধনদৌলত ? হ্যাঁ, ফিলিয়াস যে ধনী, তাতে কেউ কখনও সন্দেহ করবার অবকাশ পায় নি। অতবড় বাড়িতে সে একা থাকে, এত বড় ক্লাবে সে সারাদিন কাটায়, এর কি কম খরচ ? তার ওপর দান ধ্যান আছে। এটা অনেকেই জানে যে প্রার্থীকে যোগ্য পাত্র বলে মনে হয় যদি, ফিলিয়াস অকৃপণ হস্তেই দান করে থাকে। অনেক সময় অনেক গোপন দানও সে করে বলে লোকের বিশ্বাস।

কিন্তু প্রশ্ন এই—এত ব্যয় সে কোথা থেকে করে ? উপার্জন সে করে না, একমাত্র গ্রাবু খেলার বাজি জেতার টাকা ছাড়া। তবে সে আর কত ? তা ছাড়া সবাই জানে যে বাজি-জেতার টাকা নিজের প্রয়োজনে কখনও লাগায় না ফিলিয়াস, সেটা প্রথম সুযোগেই দান করে দেয়।

আয় নেই অথচ ব্যয় আছে, এ-রকম লোককে ঘিরে একটা রহস্য গড়ে উঠবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। ফিলিয়াস সম্বন্ধেও পরিচিত মহলে অনেক জল্পনা হয় বই কি!

শুধু ওর আর্থিক অবস্থাটাই যে কৌতূহলীদের আলোচ্য, তা নয়। অনেক দিক্ দিয়েই লোকটা দুর্বোধ্য। গত কয়েক বৎসরের ভেতর ও ইংলণ্ডের বাইরে যায় নি, তা সবাই জানে। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোন দেশের সম্বন্ধে কথা তুলে দেখুন, ও যেন সব জায়গার সম্বন্ধেই সমান ওয়াকিফ্হাল! প্রত্যেক জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক সব রকম অবস্থা আর তথ্য ওর নখদর্পণে। দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বতে কোন অভিযাত্রী নিখোঁজ হোক, বা প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাতপ্রায় কোন দ্বীপে অজানা কোন শত্রু এসে হানা দিতে থাকুক, রিফর্ম ক্লাবের চেয়ারে বসে ফিলিয়াস ফগ ঠিক বলে দেবে যাত্রীটি কোন্ দিকের কোন্ খদে পড়ে মরেছে, বা দ্বীপের হানাদারেরা জাপান থেকে এসেছে, না অস্ট্রেলিয়া থেকে। এত বেশী বার তার এই সব অনুমান যথাসময়ে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে রিফর্ম ক্লাবের সদস্যেরা এখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে ফিলিয়াস ফগ এক ধরনের দিব্যদৃষ্টির অধিকারী।

এখন এই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের দৈনন্দিন ক্লাব জীবনের একটা বিবরণ শুনবেন? সাড়ে এগারোটায় ক্লাবের ভোজন কক্ষে তার প্রাতরাশ। সে এক রাজসিক ব্যাপার। পৃথিবীর চার কোণ থেকে উপাদেয় খাদ্যসম্ভার এসে প্রতিদিন জমায়েত হয় রিফর্ম ক্লাবের ভাঁড়ার ঘরে, আর সে-সবের সদ্ব্যবহার করবার দায়িত্ব ফিলিয়াস-প্রমুখ সদস্যদের ওপরেই।

প্রাতরাশ ভোজনের জন্য ফিলিয়াসের নিজস্ব একখানি টেবিল আছে এক কোণে, ফিলিয়াস একাই খায় সেখানে। কাউকে কোনদিন ডাকে না এক সাথে খাওয়ার জন্য, তাকে কেউ ডাকলেও কোন একটা অছিলায় নিমন্ত্রণটা সে প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কিছু মনে করে না, কারণ খেয়ালী বলে ওর একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি ক্লাবে শিকড় গেড়ে বসেছে অনেকদিন থেকে।

খাওয়ার টেবিলে দু-খানা অতিকায় সংবাদপত্র রেখে যায় পরিবেশক—টাইম্স্ ও স্ট্যাণ্ডার্ড। অন্য লোক ওর একখানা পড়তেই হিমশিম খেয়ে যাবে, ফিলিয়াস দু-খানাই পড়বে তন্ন তন্ন করে। সুতরাং প্রাতরাশ এবং

সংবাদপত্র পর্ব শেষ করে উঠতেই লাঞ্চের সময় এসে যায়, এবং লাঞ্চও সমাধা হয় প্রাতরাশের মত রাজসিক সমারোহে। তারপর ফিলিয়াসের সামনে আসে তৃতীয় একখানি সংবাদপত্র, যার আকার টাইমসের স্ফীত কলেবরকেও হার মানায়। এখানি হল মর্নিং ক্রনিক্‌ল্। এখানি শেষ হতে না হতে ডিনারের ঘণ্টা পড়ল। বহুপর্যায়ের সে ডিনার যে-কোন রাজপ্রাসাদের ভোজটেবিলেও বেমানান হত না।

ডিনারের পর খেলা। গ্রাবৃ। সাহেবী হুইস্ট। বাজি ধরেই খেলে ওরা। খুব বেশী বাজি অবশ্য নয়। কারণ তাসের টেবিলে বসে রাতারাতি ভাগ্য ফেরাবার প্রলোভন বা প্রয়োজন ওদের কারোরই নেই। তবু ওরা বাজি ধরে, খেলার ভেতর উত্তেজনা আনবার জন্য।

পড়াশুনা করবার অনন্ত সুযোগ আছে রিফর্ম ক্লাবে। কিন্তু ওধার দিয়েও যায় না ফিলিয়াস। বিশাল লাইব্রেরি। হেন বিষয় নেই, যার আদিমতম থেকে আধুনিকতম বই কেনা হয় নি ক্লাব-সদস্যদের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু কে পড়ে? আর যেই পড়ুক, ফিলিয়াস পড়ে না। তার যেটুকু জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন, তা সে তিনখানা দৈনিক কাগজ থেকেই আহরণ করে প্রত্যহ।

রিফর্ম ক্লাবের হাতার ভেতরেই বেড়াবার মাঠ আছে, টেনিসের কোর্ট আছে। মাঠের মাঝে মাঝে আছে সুরচিত টুকরো টুকরো উদ্যান, ফুলে ফুলে আলো, ঝরনার জলকল্লোলে মুখরিত। ও-সবের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ফিলিয়াস সচেতন নয় বোধ হয়। প্রাতরাশ, লাঞ্চ আর ডিনার, খবরের কাগজ আর হুইস্ট খেলা—এই কয়েকটি পর্ব সমাধা করতেই রাত দুপুর হয়ে যায়। বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হয় ঘুমোবার জন্য। অবশ্য ঘুমোবারও ঘর ক্লাবে আছে, কিন্তু নিজের বাড়িতে ঘুমোনোও ফিলিয়াসের একটা খেয়াল।

* * *

হুইস্টের টেবিলে সালিভান আর ফ্লানাগান, গথিয়ার র‍্যাল্‌ফ্ আর ফিলিয়াস ফগ। তাস বাঁটতে বাঁটতে সালিভান বলল—"ওহে! তোমাদের সেই ডাকাতিটার খবর কী?"

ফ্লানাগান বলল—"খবর আর কী! গেল পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের।"

গথিয়ার র‍্যাল্ফ্ ওই ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডেরই সহকারী পরিচালক। সে একটু বিব্রতভাবে জবাব দিল—"আরে না, এখনই হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বড় বড় ডিটেকটিভ পাঠানো হয়েছে পুব পশ্চিম দক্ষিণ সব দিকেই। প্রত্যেক বন্দরেই তারা নজর রেখেছে পলাতকের সন্ধানে। আমাদের তো খুব বিশ্বাস—দস্যুটাকে আমরা ধরব।"

ফিলিয়াস বলল—"দস্যু? কিন্তু মর্নিং ক্রনিকলে তার যে বর্ণনা দিয়েছে, সে তো একটা বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বর্ণনা। দীর্ঘকায় সুবেশ সুপুরুষ, মার্জিত কথাবার্তা—"

"কিন্তু তাকে ট্রেজারারের টেবিলে যেতে দেওয়া হল কেন, সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না"—মন্তব্য করে ফ্লানাগান।

গথিয়ার উষ্ণ হয়ে ওঠে—"যেতে দেবে না কেন? আমাদের ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে যে ইংরেজমাত্রই সৎ। চুরি? এটা দৈব দুর্ঘটনা! মানুষ পথ চলে, সবাই নিরাপদেই চলে, লক্ষের ভেতর একজন হয়ত আছাড় খেয়ে হাড়গোড় ভেঙে বসে। তা বলে কি মানুষের পথ-চলা নিষেধ করতে হবে? না, না, ব্যাঙ্কে টাকা লেনদেন হচ্ছে বলেই যে সেখানে পায়ে পায়ে লোহার বেড়া দিতে হবে, দুই গজ পরে পরে পাহারা রাখতে হবে, এমন কোন কথা নেই।"

"নেই বলেই তো চুরি হতে পারে"—আবার একটা বিরূপ মন্তব্য।

"অধিকাংশ মানুষ অসৎ হলে যা হতে পারত, তার হাজার ভাগের এক ভাগও হয় না। এই সেদিনকার কথাই ধর না! লাইন দাঁড়িয়ে গেছে ট্রেজারারের টেবিলের সামনে। টেবিলে ছিল একটা ভারী সোনার বাট। লাইনের প্রথম ভদ্রলোক কৌতূহলের বশে তুলে নিলেন বাটখানা! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। ট্রেজারারের হুঁশ নেই। এদিকে লাইনের দ্বিতীয় লোকটি বাটখানা তুলে নিয়েছেন প্রথমের হাত থেকে, তিনিও দেখছেন জিনিসটা। দ্বিতীয়ের হাত থেকে তৃতীয়, তৃতীয়ের হাত থেকে—অর্থাৎ এমনি করে লাইনের শেষ মাথায়, গেটের বাইরে চলে গেল বাট। ট্রেজারার খেয়ালই করেন নি যে তাঁর টেবিলের সোনার বাট টেবিলে আর নেই।"

"বাঃ, ট্রেজারারের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছ নিশ্চয়?"

সে-কথায় কান না দিয়ে গথিয়ার বলে যাচ্ছে—"অবশেষে ট্রেজারারের খেয়াল হল, যখন আধ ঘণ্টা পরে বাটখানা আবার ঊর্ধ্বমুখী গতিতে হাতে

হাতে ফিরে এল টেবিলে। ইংরেজ জাত অসাধু হলে এমনটা হতে পারত? লোহার বেড়া বা পাহারা বসিয়ে এ-জাতের অপমান করা উচিত বলে মনে কর তোমরা?"

মুচকি হেসে ফ্লানাগান বলল—"আমরা শুধু মনে করি যে, সোনার বাটটা যখন আধঘণ্টা পরে ফিরে এসেছিল, পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ডের এই ব্যাঙ্কনোটের বাণ্ডিলটা অন্ততঃ হপ্তাখানেক পরে ফিরে আসা উচিত।"

সালিভান টিটকারি দিল—"হপ্তাখানেকে বাণ্ডিল উত্তরে নরওয়ে বা দক্ষিণে মরক্কোয় পৌঁছোতে পারে।"

ফিলিয়াস ফগ তাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জবাব দিল—"তা পারে বই কি! পৃথিবী আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে।"

"ছোট? কী রকম?"—তিনজনের প্রশ্ন এক সাথে।

"ছোট এই অর্থে যে আগে দুই বৎসর তিন বৎসর লাগত পৃথিবীর চারদিক্ ঘুরে আসতে, এখন লাগে—"

"মাস ছয়েক। হ্যাঁ, সে অর্থে পৃথিবী ছোট হয়েছে ঠিকই।"

"মাস ছয়েক?" প্রতিবাদ করে ফিলিয়াস—"অতও নয়। মর্নিং ক্রনিক্ল্ এই দেখ হিসেব করে দেখিয়েছে—মাত্র আশী দিনে পৃথিবীর চারদিক্ ঘুরে আসা যায়।"

কোথা থেকে কথা কোথায় গড়াল। চুরির কথা চাপা পড়ে সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াল পৃথিবী পরিক্রমার কথা। মর্নিং ক্রনিক্ল্ কী হিসাব দিয়েছে, দেখতে চাইল সবাই। ফিলিয়াস কাগজ খুলে দেখাল—এই রকম একটা হিসাব তাতে দেওয়া হয়েছে—

লণ্ডন থেকে সুয়েজ (রেল ও স্টীমারযোগে মণ্টসেনিস ও ব্রিন্দিসির ভেতর দিয়ে)	...	৭	দিন
সুয়েজ থেকে বোম্বাই (স্টীমার)	...	১৩	,,
বোম্বাই থেকে কলকাতা (রেল)	...	৩	,,
কলকাতা থেকে হংকং (স্টীমার)	...	১৩	,,
হংকং থেকে ইয়োকোহামা (স্টীমার)	...	৬	,,
ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিস্কো (আমেরিকা) (স্টীমার)	...	২২	,,
সান্‌ফ্রান্সিস্কো থেকে নিউইয়র্ক (রেল)	...	৭	,,
নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন (স্টীমার ও রেল)	...	৯	,,
		৮০	দিন

হিসাব দেখে ফিলিয়াসের বন্ধুরা তো হেসে খুন !

"কাগজ-কলমের হিসাব অনুযায়ী হাতে-কলমে কাজ করা যায় না হে !"—মন্তব্য তাদের !

"আমার তো বিশ্বাস যায় !"—শান্তভাবেই বলে ফিলিয়াস।

"যায় ? কেউ করে দেখাক !"—সালিভান টিটকারি দিয়ে ওঠে।

"দেখাতে আমিই পারি"—ফিলিয়াস বলে তাস বাঁটতে বাঁটতে।

"পারো না। ও-হিসাব হিসাবই নয় হে। কথার কথা বলছি—স্টীমার সাতদিনে লণ্ডন থেকে সুয়েজে যাবে তো ? ধর, বিস্কে উপসাগরে তুমুল ঝড় হল। স্টীমার ভয় পেয়ে ভিড়ে রইল স্পেনের উপকূলে। বেরুতে পারল না দুইদিন। কিংবা ধর, বোম্বাই থেকে কলকাতায় পৌঁছোবার কথা তিন দিনে। রেলের পথ—হিন্দুরা রেল লাইনটাই উপড়ে দিয়ে বসে রইল। তারা তো শুনেছি দেশে এসব নতুন জিনিসের আমদানি মোটেই পছন্দ করছে না। এরকম হাজার ব্যাঘাত আসতে পারে। দুটো একটাও আসে যদি, ও-হিসাব বরবাদ হয়ে যাবে।"

"না, যাবে না"—দৃঢ়স্বরে ফিলিয়াস বলে—"ব্যাঘাত আসতে পারে নিশ্চয়ই, এলে তা অতিক্রম করতে হবে; ওই আশি দিনের ভেতরই অতিক্রম করতে পারা যাবে বলে আশা করি।"

"আশা কর ? নিশ্চয় করে বলতে পার না তো ?"

"এমন নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, কেউ যদি বিশ হাজার পাউণ্ড বাজি ধরতে চায় এ নিয়ে ; আমি রাজী আছি।"

"আরে, না—না"—সবাই বলে ওঠে অবিশ্বাসের স্বরে।

"তোমরা রাজী থাক তো বল। বিশ হাজার পাউণ্ড বাজি।"

"আশি দিনে তুমি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসবে ?"

"অবশ্য। আজ ২রা অক্টোবর বুধবার। ২১শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৮-৪৫ মিনিটে আমি এই রিফর্ম ক্লাবের এই ঘরে, তোমাদের সামনে উপস্থিত হব, পৃথিবী প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে।"

"তুমি কি আজই রওনা হতে চাইছ না কি ?"

"বাধা কি ? ডোভারের ট্রেন ৮-৪৫ মিনিটে ছাড়বে। ওই ট্রেনেই যাব আমি। তোমরা বাজিতে রাজী তো ?"

ততক্ষণে এঞ্জিনিয়ার অ্যানড স্টুয়ার্ট আর ব্যাঙ্কার ফ্যালেন্টিন এসে জুটেছে তাসের টেবিলে।

সালিভান, ফ্লানাগান আর র‍্যাল্‌ফ্‌ এবং তারা দুইজন নিজেদের ভেতর পরামর্শ করল একটু, তারপর তারা বলল—"তুমি জেদ করছ যখন, রাজী।"

পকেট থেকে চেক বই বার করল ফিলিয়াস। চেক লিখল একটা। ২১শে ডিসেম্বরের তারিখ। একটা চিঠিও লিখল দুই লাইনের, ব্যাঙ্কের নামে।

"বেরিং ব্রাদার্স বিশ হাজার পাউণ্ড দেবে তোমাদের, যদি আমি ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৮-৪৫ মিনিটে ফিরে না আসি। তোমরা তো এখানেই রইলে, তোমাদের কাছে এখন চেক নেওয়ার কোন দরকার নেই আমার! তবে একটা লেখাপড়া—"

লেখাপড়া হল—সংশ্লিষ্ট সবাই ওপক্ষে পাঁচজন, এপক্ষে একা ফিলিয়াস তাতে সই করল একে একে।

ফিলিয়াস অবিচলিত। কিন্তু বন্ধুরা একটু চঞ্চল। একটু দ্বিধা রয়েছে তাদের মনে। জেনে শুনে একটা মারাত্মক লোকসানের ভেতর যেন তারা ঠেলে দিচ্ছে ফিলিয়াসকে। এভাবে এই বাজি সে জিততে পারে না—আন্তরিকভাবেই তারা বিশ্বাস করে। কিন্তু ফিলিয়াসই নাছোড়বান্দা। তারা করবে কী?

বাজল সাতটা। ওরা বলল—"খেলা এখন থাকুক। তুমি বাড়ি গিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।"

"এত তাড়াতাড়ি? যাব এখন, প্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। একটা ব্যাগ গুছিয়ে নেওয়া শুধু। তাসগুলো বাঁটা হয়ে আছে, খেলাটা হয়ে যাক। নাও, কী রং ছিল? রুহিতন।"

খেলা চলল আরও পঁচিশ মিনিট। কুড়ি গিনি জিতেছে ফিলিয়াস। এইবার সে উঠল। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে ফিলিয়াস রিফর্ম ক্লাব থেকে বেরুলো। তারপর যথারীতি হেঁটে এসে বাড়িতে উঠল যখন, তখন আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকী।

কলিং বেল টিপতেই পাসেপার্তুর ঘরে ঘণ্টা বাজল। সে উঠল চমকে। তার মনিবের তো রাত বারোটার আগে আসবার কথা নয়! এ তবে কে ঘণ্টা বাজায়? এমন সময়ে ফিলিয়াস ডাকল—"পাসেপার্তু!"

পাসেপার্তু তবুও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

গলাটা মনিবের মতই বটে—কিন্তু—

আবার ডাক শোনা গেল—"পাসেপার্তু !"

এবার আর সন্দেহ করা সম্ভব নয়। খুবই বিরক্তভাবে পাসেপার্তু মনিবের ঘরে গিয়ে হাজির হল। এই না কি নিয়মনিষ্ঠা ? প্রথম রাত্রিতেই কথার খেলাপ ?

"দুইবার ডাকতে হল কেন ?"—জিজ্ঞাসা করে ফিলিয়াস।

"এখনো রাত বারোটা বাজে নি বলে"—জবাব দেয় পাসেপার্তু।

ফিলিয়াস দেখল তার নিজেরই দোষ। আর কথা না বাড়িয়ে সে বলল—"সে-কথা থাকুক। যা বলি, শোনো। আমরা ৮টা ১৫ মিনিটে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি। পৃথিবী ভ্রমণ করব আমরা।"

পাসেপার্তু হাঁ করে ফেলল।

"তৈরী হয়ে নাও। ৮টা ১৫তে বেরুবো আমরা।"

অতি কষ্টে পাসেপার্তু উচ্চারণ করল—"কিন্তু বাক্সটাক্স—"

"বাক্স দরকার নেই। একটা কার্পেটের ব্যাগে দুটো শার্ট আর তিন-জোড়া মোজা। আমারও, তোমারও। তারপর যখন যেমন দরকার হবে, পথে কিনে নেব। যাও, গুছিয়ে নাও।"

পাসেপার্তু নিজের ঘরে গিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। হায় রে বরাত। একটু আগেই না সে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল যে নিয়মনিষ্ঠ মনিব পেয়েছে। এইবারে সে স্থিতু হতে পারবে ?

স্থিতুই বটে ! একেবারে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরুতে হল।

ঠিক আটটা পনেরো মিনিটে সে নীচে নেমে এল একটা কার্পেট ব্যাগ হাতে করে। ব্যাগটা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে মস্ত এক তাড়া ব্যাঙ্কনোট তার ভেতর গুঁজে দিল ফিলিয়াস, তারপর ব্যাগ পাসেপার্তুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—"এটা সাবধানে রেখো। বিশ হাজার পাউণ্ড রইল এতে।"

পাসেপার্তু আবারও হাঁ করে ফেলল—এবারকার হাঁ আরও বড়।

ট্যাক্সি করে বেরিং ক্রস্ স্টেশনে এসে যখন পৌঁছালো ওরা, তখন আটটা কুড়ি। ফিলিয়াস বলল—"ডোভারের দুখানা টিকিট কিনে আনো ফার্স্ট ক্লাসের।"

এক ভিখারিনী এসে টুপি হাতে দাঁড়ালো সামনে। ফিলিয়াস পকেট থেকে বার করল সেই কুড়ি গিনি, যা রিফর্ম ক্লাবে তাসের বাজিতে সে জিতেছে। সবটাই ভিখারিনীর হাতে দিয়ে বলল—"তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

পাসেপার্তু'র মনে হল—তার চোখে জল আসছে। সে তাড়াতাড়ি টিকিট কিনতে ছুটল। দাঁড়িয়েছিল শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য যে দু-খানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিটে কে কে যাবে এবং তার নিজের জন্য কোন্ ক্লাসের টিকিট সে কিনবে। জিজ্ঞাসা করা আর হল না।

এদিকে রিফর্ম ক্লাবের বন্ধুরা এসেছেন, ফিলিয়াসকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। ফিলিয়াস সবাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বলল—"আমি যখনই যেখানে যাব, ইংরেজ কন্সালের অফিস থেকে আমার কাগজপত্রে ভিসা করিয়ে আনব।* তাই দেখে তোমরা বুঝতে পারবে আমি সত্যি সত্যি পৃথিবীটা ঘুরেছি কিনা।"

সকলে একবাক্যে বলে উঠল—"তার কোন দরকার নেই বন্ধু! আমরা কি তোমার কথায় অবিশ্বাস করতে পারি?"

ট্রেন ছাড়ল ঠিক আটটা পঁয়তাল্লিশে। পাসেপার্তু অবাক্ হয়ে দেখল যে দু-খানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের একখানা তার নিজের জন্যই। মনিব এত উদার!

কিন্তু তার মোহভঙ্গ হল অতি শীঘ্রই। সিডেনহ্যাম স্টেশনে গাড়ি পৌঁছতেই হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল—আর সে চেঁচিয়ে উঠল কপালে করাঘাত করে।

"কী হল?" জিজ্ঞাসা করল ফিলিয়াস।

"তাড়াতাড়িতে বাড়ির গ্যাসটা নিবিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছি।"

ফিলিয়াস বিরসকণ্ঠে জবাব দিল—"বিলটা তোমাকে মেটাতে হবে।"

পরের দিন।

সারা লণ্ডনে একটা হইচই! রিফর্ম ক্লাবের বাজির কাহিনী প্রত্যেক দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায়। ফিলিয়াস ফগ আশি দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ করবে বলে বেরিয়েছে। বিশ হাজার পাউণ্ড বাজি। কেউ বাহবা দিচ্ছে

---

* বিদেশে উপস্থিতি বা অবস্থিতির অনুমতি।

ফিলিয়াসকে, কেউ দিচ্ছে টিটকারি। যারা টিটকারি দিচ্ছে না, তারাও অনেকে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে এই ধরাবাঁধা সময়ের ভেতর পৃথিবী ঘুরে আসা সম্ভব নয় বোধ হয়।

ফলে সারা লণ্ডনের লোক বলাবলি করতে লাগল ফিলিয়াস ফগ বিশহাজার পাউণ্ড হারবেই। একমাত্র বৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত লর্ড অ্যালবিমার্ল —যিনি যৌবনে দুঃসাহসী পর্যটক ছিলেন, ভ্রমণ-পিপাসা মেটবার আগেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে দেহের পরিবর্তে কল্পনাকেই এখন আকাশ পৃথিবী পরিক্রমায় পাঠাচ্ছেন প্রতিনিয়ত—একমাত্র তিনিই জোরালো সমর্থন জানালেন ফিলিয়াস ফগকে। তিনি ঘোষণা করে দিলেন পাঁচ হাজার পাউণ্ড তিনিও বাজি ধরছেন—বিশ হাজার পাউণ্ডের বাজি জিতে ফিলিয়াস ফগ যদি আশি দিনের ভেতর ফিরে আসে, ওই পাঁচ হাজার পাউণ্ডও সে পাবে।

লর্ড অ্যালবিমার্লের বাজিতে ফল এই হল যে ফিলিয়াসের সাফল্য নিয়ে মৌখিক কল্পনা ক্রমশঃ একটা নতুনতরো ফাটকাবাজির আকার নিল। ফাটকার বাজারে এক অভিনব বণ্ডের আবির্ভাব হল, যার নামই "ফিলিয়াস ফগ"। একশো পাউণ্ডের একখানা দলিল ক্ষেত্রবিশেষে পাঁচ থেকে পঁচাত্তর পাউণ্ডে বিকোতে লাগল। ফিলিয়াস ফগ জিতলে ক্রেতারা পুরো একশোই পাবে। দেবে দলিলের প্রবর্তক যৌথ কোম্পানিই।

চড়া দামেই প্রথম প্রথম বিক্রি হল দুই একদিন। তারপর লণ্ডনের জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি একটা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে সর্বনাশ করে দিল ব্যবসাটার। তারা চুলচেরা হিসাব করে দেখিয়ে দিল যে আশি দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করে আসা একান্তই অসম্ভব। এ চেষ্টা যে করবে সে পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। এই ঘোষণা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজার পড়তে শুরু হল। শেষে এক একখানা করে বণ্ড বিক্রি করা আর সম্ভবই হল না। পাঁচ, দশ, পঞ্চাশখানার এক একটা বাণ্ডিল বিক্রি হতে থাকল নামমাত্র দামে।

অবশেষে সাতদিনের দিন এল এক অপ্রত্যাশিত মারাত্মক আঘাত। তার ফলে বণ্ডখানার লেনদেন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল বাজারে।

সে আঘাতটা হল একটা টেলিগ্রাম।

লণ্ডন পুলিসের দপ্তরে টেলিগ্রামখানা এসেছে সুয়েজ থেকে। তার বয়ান এই রকম—

'কাওয়ান, পুলিস কমিশনার, সেণ্ট্রাল অফিস, স্কটল্যাণ্ড স্কোয়ার। ব্যাঙ্ক ডাকাত ফিলিয়াস ফগকে পেয়েছি। অবিলম্বে গ্রেফতারী ওয়ারেণ্ট পাঠান— ব্রিটিশ ভারতের বোম্বাইয়ে।

ফিক্স, ডিটেক্‌টিভ।'

আর যায় কোথায়! ফিলিয়াসকে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলে যারা জানত, তারা চোখের পলকে ধারণা পালটে ফেলল। ফিলিয়াস ফগ যে ডাকাত, ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড লুট করে সে যে পৃথিবী ভ্রমণের অছিলায় লণ্ডন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও।

ফিলিয়াস ফগের ফটো পাওয়া গেল রিফর্ম ক্লাবে। সন্দেহভাজন অপরাধীর চেহারার যে-বর্ণনা পুলিসের হাতে ছিল, তার সঙ্গে ফটোর আশ্চর্য মিল। তাছাড়া ক্লাব-সদস্যদের সাক্ষ্য থেকে জানা গেল—ফিলিয়াস লোকটা ছিল আগাগোড়া একটি দুর্বোধ্য জীব, রহস্যে আবৃত তার জীবনযাত্রার ধারা, প্রচুর ব্যয় অথচ আয়ের নামগন্ধ নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যারা ফিলিয়াস ফগ বণ্ড কিনেছে তারা মাথায় হাত দিয়ে বসল। কিন্তু রিফর্ম ক্লাবের পঞ্চসদস্য—যাঁদের হাতে বিশহাজার পাউণ্ডের চেক এসে রয়েছে, তাঁরা একটা স্বস্তি অনুভব করলেন মনে মনে। নিরপরাধ ভদ্রলোকের মবলগ টাকা বাজিতে জিতে নেওয়াতে একটা লজ্জাবোধ থাকতে পারে। কিন্তু একটা দস্যুর টাকাতে ভাগ বসানো—সে স্বতন্ত্র কথা।

বিশ হাজার পাউণ্ড—পাঁচজন ভাগীদার। মাথা পিছু চার হাজার। বাঃ! হাতে এসে গিয়েছেই বলা চলে। কারণ আশি দিনের অনেক আগেই ফিলিয়াস ফগকে ধরে ফেলবে ফিক্স এবং বোম্বাই থেকেই তার যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেবে পুব থেকে পশ্চিমে।

(২)

টেলিগ্রামখানার ব্যাপার এইবার খুলে বলা যাক।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড থেকে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড চুরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সব দিকে বড় বড় বন্দরে সুদক্ষ গোয়েন্দা পাঠানো হয়েছিল। ব্যাঙ্ক দস্যু বলে সন্দেহ হতে পারে, এমন কোন লোককে কোন জাহাজে দেখতে পেলে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং লণ্ডনে ওয়ারেন্ট চেয়ে পাঠানোই হল তাদের কাজ।

সুয়েজ বন্দরে যাকে পাঠানো হয়েছে, সে হল গোয়েন্দা ফিক্স। অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্তব্যনিষ্ঠ লোক।

ফিক্স সুয়েজে এসে প্রতি জাহাজের প্রত্যেক যাত্রীকে পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড লুট করে এনেছে, কোন লোকেরই হাবভাব দেখে এমন ধারণা সে করতে পারে না। চেহারা? চেহারার কোন বর্ণনাই তো হেড অফিস তাকে দিতে পারেনি। কাজেই ঢ্যাঙ্গা বেঁটে, সরু মোটা সব লোককেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে সে বাধ্য হয়। দেখতে দেখতে চোখ টনটনিয়ে ওঠে বেচারার। কিন্তু যাকে চায় তার দেখা সে পায় না।

অবশেষে কতকটা সুবিধা তার হল। লণ্ডন থেকে অপরাধীর চেহারার বর্ণনা পেল সে।

৯ই অক্টোবর, বুধবার।

সকাল এগারোটায় মঙ্গোলিয়া স্টীমারের সুয়েজে ভেড়বার কথা। যথারীতি ফিক্স জেটিতে পায়চারি করছে। সঙ্গে আছেন ব্রিটিশ কন্সাল। এঁর অফিস বন্দরের গায়েই। ফিক্স এঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে এবং এখানে নিজের উপস্থিতির কথাটাও এঁকে জানিয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কোন-না-কোন জাহাজে দেখতে পাবে, ফিক্স সর্বান্তঃকরণে এই আশা করছে। না পেলে সমূহ লোকসান বেচারা ডিটেক্‌টিভের। দস্যু যদি ধরা পড়ে, তবে তার কাছ থেকে ব্যাঙ্কের যে-পরিমাণ অর্থ উদ্ধার হবে, তার ওপরে শতকরা একটা কমিশন দেওয়া হবে গ্রেফতারকারীকে। সে-অর্থটা ফিক্স না পেয়ে অন্য ডিটেক্‌টিভ যদি পায়, তাহলে সেটা তো ফিক্সের পকেট থেকে খোয়া যাওয়ারই সামিল হবে।

কন্সালকে তাই জপাচ্ছে ফিক্স। আসামী আসবার আগেই বন্দোবস্ত করে রাখা দরকার।

কন্সাল ব্রিটিশ রাজের কর্মচারী। কাজেই ফিক্সের সহযোগিতা তিনি না করবেন কেন? তাঁর সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই তিনি করতে প্রস্তুত দস্যুকে ধরবার জন্য।

"লোকটা এসেই নিশ্চয় আপনার কাছে পাসপোর্ট নিয়ে আসবে – ভিসা করাবার জন্য। ওইটিতে একটু দেরি করিয়ে দেবেন, যাতে সঙ্গে সঙ্গে সে আবার স্টীমারে উঠতে না পারে।"

কন্সাল বিব্রতভাবে বললেন—"দেরি মানে কত দেরি? চার ঘণ্টা দেরি তো কোনমতেই করা যায় না একটা ভিসা সই করতে! অথচ স্টীমার এখানে দাঁড়াবে পুরো চার ঘণ্টা কয়লা বোঝাই নেবার জন্য।"

"কিছু বে-আইনী যদি হয়ও, আইনের মুখ চেয়েই সেটা করতে হবে কন্সাল! একটা দস্যু—পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড লুট করা দস্যু—তাকে পাকড়াবার জন্য যদি ভিসার আইনের একটু এদিক ওদিক যেতে হয়—"

"ভিসার আইন আপনার চোখে তুচ্ছ হলেও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ওই আইন কার্যকরী করবার জন্যই আমি এখানে আছি। দস্যু ধরা যেমন আপনার কর্তব্য, ভিসাতে সময়মত সই দেওয়া তেমনি আমারও কর্তব্য।"

ফিক্স তবু নাছোড়বান্দা। "ভেবে দেখুন, এই স্টীমারটা তাকে ফেল করিয়ে দিতে পারলেই তাকে এখানে দুই একদিন থাকতে হবে। সেই অবসরে আমি টেলিগ্রাম করে লণ্ডন থেকে ওয়ারেণ্ট আনিয়ে নেব।"

আর বাক্যব্যয় না করে কন্সাল নিজের অফিসের দিকে যাত্রা করলেন। ওদিকে মঙ্গোলিয়া এসে বন্দরে ভিড়ল।

ফিক্স তরতর করে উঠে গেল স্টীমারে।

পনেরো মিনিট বাদেই সে হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত কন্সালের অফিসে। ভয়ানক উত্তেজিত সে।

"কন্সাল! কন্সাল! সত্যই সে এসেছে।"

"বলেন কি?" কন্সালও কম উত্তেজিত নন—"সেই দস্যু?"

"বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে চেহারা। লোকটার নাম ফগ, ফিলিয়াস ফগ।"

"হুঁ, নামছে না কি বন্দরে? দস্যু যদি হয়, সে সাহস করে নামবে বলে তো মনে হয় না। আর না নামলে তো ভিসার প্রয়োজনই নেই।"

"নামবার তোড়জোড় করছে দেখে এলাম। ভৃত্যকে বলল—'যা যা কেনবার কাছে, এইখানে কিনে নাও, আমি ভিসা করাতে যাচ্ছি।"

"তাহলে মশাই ও দস্যু কিনা—আমার সন্দেহ আছে। আর দস্যু হলেও ওর ভিসাতে সই করতে আমি বাধ্য।"

বলতে বলতেই এক দীর্ঘকায় সুবেশ ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন অফিসে। এসেই পাস্‌পোর্টখানি এগিয়ে দিলেন কন্‌সালের দিকে।

"দয়া করে এটা ভিসা করে দিন।"

পাস্‌পোর্টের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কন্‌সাল বললেন—"আপনি মাননীয় ফিলিয়াস ফগ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সঙ্গে ভৃত্য আছে?"

"হ্যাঁ, নাম পাসেপার্তু, জাতিতে ফরাসী।"

"লণ্ডন থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"যাবেন—"

"বোম্বাই।"

"তা হলে নেমে এসে এখানে ভিসা সই করানো কেন? না নামলে তো এর দরকার হত না।"

"তা হত না। কিন্তু ভিসার দ্বারা আমি একটা প্রমাণ রাখতে চাই যে আমি সুয়েজে এসেছিলাম।"

"তা বেশ"—বলে কন্‌সাল সই করে দিলেন। ফিলিয়াস ফী মিটিয়ে দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

অভাগা ফিক্স তখন রাগে হাত কামড়াচ্ছে। কী নিরেট এবং কী একগুঁয়ে এই কন্‌সালটা! কর্তব্য সম্বন্ধে এমন আজগুবি ধারণা নিয়ে কী করে ও এমন-একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে!

কিন্তু তাকে আর বলবার কিছু নেই এবং নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লেও তো চলছে না। এক ডাল ভেঙেছে তো অন্য ডাল ধরতে হবে।

ফিলিয়াস ফগকে সুয়েজে আটকানো যাচ্ছে না। বোম্বাই ও যাবেই। আচ্ছা যাক ও বোম্বাই পর্যন্ত। সেখানেই ওকে ধরবে ফিক্স। কমলি নেহি ছোড়েগা।

তার প্রথম কাজ হল টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা তার পাঠানো। সেই তারের কথাই বলা হয়েছিল আগের অধ্যায়ের শেষ দিকে। লণ্ডনের সেণ্ট্রাল পুলিস অফিসে কমিশনার কাওয়ানের কাছে তার—"ওয়ারেণ্ট পাঠাও! পাঠাও শীঘ্র ওয়ারেণ্ট!"

* * *

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়ার পরেও হাতে অনেক সময়। স্টীমার ছাড়তে এখনও তিন ঘণ্টার ওপর দেরি। এ-সময়টা কাজে লাগানো যাক। ফগ মানুষটার একটা ভৃত্য আছে। জাতিতে সে ফরাসী। তার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলে ভেতরকার অনেক রহস্য জানা যেতে পারে। ভৃত্যেরা সাধারণতঃই মনিবদের সম্বন্ধে গল্প করতে ভালবাসে, তার ওপরে লোকটা আবার ফরাসী। কে না জানে যে ফরাসী মাত্রেই কথা বলতে ভালবাসে?

পাসেপার্তু জিনিসপত্র কিনছিল। মাঝে মাঝে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বন্দরের সৌন্দর্যও পর্যবেক্ষণ না করছিল, তা নয়। ফিক্স তো জাহাজেই তাকে দেখেছে, কাজেই খুঁজে বার করতে বেগ পেলো না বিশেষ। কাছে গিয়েই আলাপ জমাল—"কী মশাই, একটু আগেই না জাহাজের ওপর দেখলাম আপনাকে?"

"দেখলেন বুঝি?"—জবাব দেয় পাসেপার্তু।

"দেশটা দেখছেন?"

"তা দেখছি। এটা সুয়েজ, না?"

"সুয়েজই বটে।"

"মিসর দেশ তা হলে?"

"নিশ্চয়!"

"অর্থাৎ সেই আফ্রিকা?"

"তাতেও ভুল নেই" ফিক্স হাসি চাপে কোন মতে।

"ভুল তো নেই"—পাসেপার্তুর অভিযোগ বোমার মত ফেটে বেরোয়—"ভুল তো নেই, কিন্তু এতদূর আসব—এমনটা আমি ভাবিও নি। মনিব যখন বাড়ি থেকে বেরুলেন—বললেন বটে যে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরুচ্ছি। আমি তা বিশ্বাস করি নি—কারণ পাগল ছাড়া আর কেউ পৃথিবীটা ঘুরে আসবার কথা মাথায় আনতে পারে না। কেন আনবে মাথায়? কী দরকার? গাঁটের পয়সা খরচ করে সারা পৃথিবী ঘুরবার মানেটা কী হতে

পারে ? পৃথিবীটা কি একটা ঘুরবার জায়গা ? এই দেখুন না, সুয়েজ এটা। এইটুকুন, খালের ধারটারগুলো দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু একটু এদিক ওদিক গেলেই সেই আফ্রিকা। আফ্রিকালের জঙ্গল, সিংহ, গরিলা, নরখাদক মানুষ। এও কি ঘুরে দেখবার জিনিস না কি ?"

ফিক্স সায় দিল—"না, এ সব সত্যিই দেখবার জিনিস নয়।"

জোর দিয়ে পাসেপার্তু পুনরুক্তি করল—"তাই বলুন। এসবও দেখবার জিনিস নয়, পৃথিবীটাও ঘুরবার জায়গা নয়। আমি বিশ্বাস করি নি যে আমার মনিব সত্যিই পৃথিবীটা ঘুরবার জন্য যাচ্ছেন। ভেবেছিলাম —বড় জোর প্যারি পর্যন্ত আমরা যাব। বলতে কি, সে-কথা ভেবে আমার একটু আনন্দও হয়েছিল। কারণ আমি তো ফরাসী দেশেরই লোক, পাঁচ বৎসর পরে প্যারি শহরে, নিজের দেশে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে পাব ভেবে খুবই খুশী হয়েছিলাম মশাই। কিন্তু কার্যকালে হল কি শুনবেন ? সকালে সাতটা কুড়ি থেকে আটটা চল্লিশ পর্যন্ত রেলগাড়ির জানালা দিয়ে প্যারির যতটুকু দেখা যায়, তাই ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। উত্তর স্টেশন থেকে লিয়ঁ স্টেশন পর্যন্ত। তাও আবার তুমুল বৃষ্টি তখন ! এঃ, সাঁ-ইলাইজিটা আর একবার দেখার এত ইচ্ছে ছিল।"

ডিটেক্টিভ একটু একটু করে সাবধানে পা বাড়াচ্ছে—জিজ্ঞাসা করল—"তোমাদের তাহলে খুবই তাড়াতাড়ি ?"

"না, আমার তাড়া কিছুই নেই, তবে আমার মনিবের আছে। ও মশাই, এখনও শার্ট আর জুতো কিনতে বাকী আমার। বাক্সফাক্স কিছুই তো আনি নি, একটিমাত্র কার্পেট ব্যাগ হাতে করে মনিব-চাকর বেরিয়ে পড়েছি।"

"বটে না কি ? আচ্ছা চল, তোমায় এমন একটা দোকান দেখিয়ে দিচ্ছি যেখানে সব-কিছুই তুমি পাবে।"

পাসেপার্তু কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেল—'ধন্যবাদ মশাই, বড় দয়া আপনার।"

রওনা হল দু'জনে, পাসেপার্তুর মুখ চলছে অনবরত। হঠাৎ সে বলে উঠল—"কেনা কাটা সেরে তাড়াতাড়ি ফেরা চাই। স্টীমার ফেল করলে তো চলবে না !"

স্টীমার ফেল করবে কোন দুঃখে। সে তো ছাড়বে তিনটের সময়। এখন সবে বারোটা।"

"অ্যাঁ? বারোটা? অতও নয় তো!"—পাসেপার্তু পকেট থেকে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি টেনে বার করল—"মোটে দশটা বাজতে আট মিনিট।"

"তোমার ঘড়ি ঠিক নেই।"—বলে ফিক্স।

"আমার ঘড়ি ঠিক নেই? চার পুরুষের ঘড়ি মশাই। বছরে পাঁচ মিনিটের হের ফের হয় না।"

"ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি"—বলে ফিক্স—"তোমার ঘড়িতে লণ্ডনের সময় চলছে। সেটা সুয়েজের সময় থেকে দুঘণ্টা পেছনে। প্রত্যেক দেশে পৌঁছে দুপুর বেলায় ঘড়ি ঠিক করে নেওয়া দরকার।"

'বলছেন কী? ঘড়ির কাঁটা ঘোরাব? আমি?"—পাসেপাতু যেন সে কল্পনাতেই শিউরে ওঠে। সে যেন মহাপাপ।

"না ঘোরালে সূর্যের গতির সঙ্গে তোমার ঘড়ির মিল থাকবে না।"

"তাতে সূর্যেরই লোকসান। প্রমাণ হবে যে সূর্যই ঠিক চলছে না"

এই বলে একটা রাজকীয় ভঙ্গীতে তার বিরাট ঘড়ি পকেটে পুরল পাসেপার্তু।

ফিক্স এই অবসরে পুরাতন প্রশ্নটা তুলল আবার—"লণ্ডন থেকে তা হলে খুবই তাড়াতাড়ি বেরিয়েছ?"

"আপনিই বিচার করুন। গত বুধবার, সন্ধ্যা আটটা তখন। মনিব তাঁর চিরদিনের রীতি ভেঙে, সেই সময় তাঁর ক্লাব থেকে ফিরে এলেন বাড়িতে। আর তার তিন কোয়ার্টার বাদে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে।"

"কিন্তু যাচ্ছেন কোথায় তোমার মনিব?"

"যাচ্ছেন সোজা নাক-বরাবর। পৃথিবীটা ঘুরে আসবেন।"

"পৃথিবীটা ঘুরে আসবেন?"—অবিশ্বাসের হাসি হাসে ফিক্স।

"হ্যাঁ, আশি দিনে। বাজি হয়েছে মশাই, বাজি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি ও-কথা বিশ্বাস করি না। এতটুকুন বুদ্ধি যার ধড়ে আছে, সে বিশ্বাস করবে না। ওর ভেতর অন্য কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়!"

"তোমার মনিব খুব ধনী, অ্যাঁ?"

"তাই তো মনে হয়। সাথেই তো এত-এত নগদ টাকা! আর কী দরাজ হাতে খরচা! জানেন, মঙ্গোলিয়ার এঞ্জিনিয়ারকে কী বলেছেন উনি? বলেছেন—নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু আগে বোম্বাই পৌঁছুতে পারলে মোটা বকশিশ দেবেন তাঁকে।"

"তাই না কি!" ফিক্সের চোখ ক্রমে ছানাবড়া হয়—"আচ্ছা, এর সঙ্গে কতদিন আছ তুমি?"

"আমি?"—হেসে ফেলে পাসেপার্তু। "যেদিন সন্ধ্যায় লণ্ডন থেকে বেরুলাম, সেইদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় আমার চাকরি শুরু।"

যত শোনে ফিক্স, ততই ফিলিয়াস ফগের সম্বন্ধে তার আগের ধারণা বদ্ধমূল হয়। এত রহস্যে ঘেরা যার রীতিচরিত্র গতি-বিধি, সে লোক ডাকাত হবে না তো হবে কে? ব্যাঙ্কে ডাকাতি হল, তার ঠিক পরেই তিন-তাড়াতাড়ি লণ্ডন থেকে যাত্রা! সঙ্গে রাশি রাশি অর্থ! দূরে দূরান্তরে পৌঁছোবার জন্য এই আকুল চেষ্টা। একটা আজগুবি বাজির অছিলা! সব কিছুই একটা মাত্র জিনিসের ইঙ্গিত দেয়। সে-ইঙ্গিত এই যে ফিলিয়াস ফগ আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য পালাচ্ছে।

পাসেপার্তুর সঙ্গে ক্রমাগত কথা চালিয়ে চালিয়ে এ-বিষয়ে ফিক্স নিশ্চিত হল যে মনিবের সম্বন্ধে এ-লোকটা সত্যিই কিছুই জানে না। আরও নিঃসন্দেহ হল এই বিষয়ে যে ফিলিয়াস ফগ সামাজিক জীবও নয়, স্বাভাবিক মানুষও নয়। কারণ সে যাপন করে নিঃসঙ্গ জীবন, কারণ তার আয়ের কোন পথ না থাকলেও সে ধনী বলে পরিচিত, কারণ তার প্রত্যেকটা আচরণই রহস্যে জড়িত।

সুয়েজের ভিসা নিতে দেখে একবার ফিক্সের সন্দেহ হয়েছিল দস্যুটা বোধ হয় সুয়েজেই থেকে যাবে, এবং সুয়েজ থেকে ক্রমশঃ সরে যাবে অজ্ঞাত আফ্রিকার কোন বিজন প্রদেশে। চোর-ডাকাতের নিরাপদ বসবাসের মত স্থান তো আশেপাশে প্রচুর!

কিন্তু না। পাসেপার্তুর সঙ্গে আলাপের ফলে সে-সন্দেহের নিরসন হয়েছে ফিক্সের মন থেকে। বোম্বাই সত্যিই যাচ্ছে লোকটা। না গেলে ভারি সঙ্গিন অবস্থা হত। ওয়ারেণ্ট যেত বোম্বাই, আসামী থাকত বিস্তীর্ণ আফ্রিকার কোন এক অন্ধকার অরণ্যে। ভগবান রক্ষা করেছেন ফিক্সকে।

পাসেপার্তু জিজ্ঞাসা করছে "বোম্বাই কি অনেক দূর?"

"তা দূর বই কি! জাহাজ পৌঁছবে দশ দিনে। তাতে ঘাবড়াবার কী আছে?"

"না, তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি ঘাবড়াচ্ছি আমার গ্যাসের বিলের কথা ভেবে।"

"গ্যাসের বিল?"—আবারও অবাক হয় ফিক্স।

"হ্যাঁ গো মশাই। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় গ্যাসটা নিবিয়ে আসতে ভুলেছি। আমার দোষে চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলে চলেছে সেই গ্যাস এবং জ্বলতেই থাকবে—যতদিন আমরা না ফিরছি। খরচটা ভাবুন একবার। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দুই শিলিং। আমার মাইনের চাইতে ছয় পেনী বেশী। বুঝুন একবার! বিলটা আমারই মেটাতে হবে, কারণ ভুলটা আমার।"

ফিক্স এ-কথায় কান দিচ্ছে মনে হল না। সে ভাবছে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। তাড়াতাড়ি পাসেপার্তুকে একটা দোকানে পৌঁছে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। আসামীকে সে চোখের আড়াল করতে পারে না। এই মঙ্গোলিয়াতেই তাকেও যেতে হবে।

সামান্য মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে, পকেটে প্রচুর অর্থ নিয়ে সে যখন মঙ্গোলিয়ায় গিয়ে উঠল, তখনও স্টীমার ছাড়তে পনেরো মিনিট বাকী।

* * *

লোহিত সমুদ্র বড় খেয়ালী। প্রায়ই বড় বড় ঢেউ ওঠে এর বুকে। এশিয়ার দিক থেকে হক, আফ্রিকার দিক থেকে হক—যখনই জোর বাতাস বইতে থাকে, ঢেউয়ের ঘায়ে জাহাজখানা দারুণ রকম দোলে। মহিলা-যাত্রীরা তখন অদৃশ্য হয়ে যান, পিয়ানো হয় নীরব, নাচগান সব যায় থেমে। স্টীমার কিন্তু ঝড় এবং ঢেউ সব অগ্রাহ্য করে পূর্ণ বেগে বাবেলমাণ্ডের প্রণালী অতিক্রম করতে থাকে। এঞ্জিনিয়ারের যে বকশিশের প্রত্যাশা আছে একটা!

ততক্ষণ ফিলিয়াস ফগ করে কী? কিছু না। ঝড়ে জাহাজ ডুবে যাবে, কি ঢেউয়ে জাহাজ ভেঙে যাবে—এরকম আশঙ্কা তার মনে জাগলেও মুখে তার আভাসমাত্রও প্রকাশ পায় না। রিফর্ম ক্লাবের চেয়ারে তার যে নিরুদ্বেগ অচঞ্চল মূর্তি দেখা গিয়েছে, সেইটিই দেখা যাচ্ছে এই আথাল-পাথাল সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত জাহাজের ওপর। জাহাজটা ঘায়েল হলে

তার বিশ হাজার পাউণ্ডের বাজিও যে বানচাল হবে—সেটা মনেপ্রাণে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করেও একান্ত অবিচলিত ভাবে সে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। চার বেলা খাচ্ছে এবং ফাঁকে ফাঁকে তাস খেলছে।

হ্যাঁ, তাসের নেশাগ্রস্ত লোক কোথায় নেই? নানাদেশের তাসাড়ু এসে একত্র হয়েছে এই স্টীমারখানায়। এক পর্তুগীজ কালেক্টার যাচ্ছে গোয়ায়, এক স্কট পাদরি যাচ্ছে বোম্বাই, এক ইংরেজ সহকারী সেনাপতি যাচ্ছে বেনারস, তার সৈন্যদলের ছাউনি সেখানেই। এদের নিয়ে ফিলিয়াস তাসের আসর বসাল। সামুদ্রিক পীড়া? জাহাজে অনেকে তাতে কাতর হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু ফগ তার আক্রমণ এড়িয়ে গেছে, পাসেপার্তুও।

বস্তুতঃ পাসেপার্তু মোটামুটি আনন্দেই রয়েছে। মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে বোম্বাইয়ের ওধারে আর যেতে হবে না তাদের, মনিবের খেয়াল ইতিমধ্যেই পরিতৃপ্ত হবে যাবে। এই বিশ্বাসে বুক বেঁধে সে প্রাণপণে খেয়ে যাচ্ছে, এবং দুচোখ বিস্ফারিত করে দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছে। বাবেলমাণ্ডের দুই কূলেই তো ইতিহাসের আদিমতম মানুষের কীর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ!

অবশেষে একদিন পাসেপার্তু দেখতে পেল ফিক্সকে। এতদিন একটু গা-ঢাকা দিয়েছিল তুখোড় গোয়েন্দা।

পাসেপার্তু গিয়ে ধরল তাকে—"আপনিই তো সেই ভদ্রলোক—যিনি দয়া করে সুয়েজে আমাকে দোকান দেখিয়ে দিয়েছিলেন?"

"আরে এই যে।"—ফিক্স বেশ হাসিমুখে জবাব দেয়—"তুমি সেই—সেই খেয়ালী ইংরেজ ভদ্রলোকের ভৃত্য তো? হ্যাঁ—চিনেছি তোমাকে।"

"আপনি—?"

"আমি হচ্ছি ফিক্স।"

"আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুব খুশী হয়েছি মিস্টার ফিক্স! তা আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

"তুমিও যেখানে যাচ্ছ, আমিও সেখানেই।"

"বোম্বাই? বাঃ, ভালই হল। আপনি আগেও সেখানে গিয়েছেন?"

"কতবার! আমি এই স্টীমার কোম্পানিরই এজেণ্ট কিনা!"

"তাহলে ভারতবর্ষের কথা আপনি সবই জানেন।"

"কতকটা জানি বই কি"—ফিক্স পুরোপুরি ধরা দেয় না।

"আশ্চর্য জায়গা শুনেছি ভারতবর্ষ।"

"তা আশ্চর্য বই কি! মসজিদ মিনার মন্দির প্যাগোডা আছে, সাপ বাঘ কুমির আছে, ফকির সন্ন্যাসী নাচওয়ালী আছে। কিন্তু সে-সব দেখার সময় তুমি পাবে তো?"

"আশা তো করি মিস্টার ফিক্স। ক্রমাগত স্টীমার থেকে লাফিয়ে রেলগাড়িতে, আর রেলগাড়ি থেকে লাফিয়ে স্টীমারে ওঠা কোনও প্রকৃতিস্থ মানুষ এমনধারা ব্যাপার চিরদিন চালিয়ে যেতে পারে না। আশি দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ করবার গরজ থাকলেও না। আমার তো খুব ধারণা, এসব জিমন্যাস্টিকের কসরত বোম্বাইতেই খতম হবে!"

"তা তোমার মনিব আছেন ভাল?"—বেশ সহজস্বরেই প্রশ্ন করে ফিক্স।

"খুব ভাল, মিস্টার ফিক্স খুব ভাল। আর আমিও বেশ ভাল আছি। উপবাসী রাক্ষসের মত খাচ্ছি। সমুদ্রের হাওয়াতে হজমশক্তি এত বেড়ে যায়!"

"কিন্তু তোমার মনিব কখনও ডেক-এ আসেন না তো!"

"কেন আসবেন? কৌতূহল তাঁর নেই।"

"আচ্ছা, মিস্টার পাসেপার্তু, তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে, এই কাল্পনিক ভূ-প্রদক্ষিণের আড়ালে কোন একটা গোপন উদ্দেশ্য লুকোনো থাকতে পারে? যেমন ধর—রাজনৈতিক কোন দৌত্য?"

"সত্যি বলতে কি, মিস্টার ফিক্স, আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানি নে, এবং জানবার এতটুকু কৌতূহলও আমার নেই।"

এর পর থেকে দুজনে প্রায়ই আলাপ হয়। ডিটেকটিভ ভাবে—এ-সংশ্রব জীইয়ে রাখাতেই তার স্বার্থ। ওর দ্বারা কাজ পাওয়া যেতে পারে কোন সময়। মঙ্গোলিয়ার পানের ঘরে নিয়ে গিয়ে সে প্রায়ই পাসেপার্তুকে মদ খাওয়ায়। পাসেপার্তুই বা কম যাবে কেন? সেও পাল্টে আতিথ্যে ফিক্সকে আপ্যায়িত করে। 'চমৎকার ভদ্রলোক এই ফিক্স—' মনে মনে ভাবে পাসেপার্তু।

এদিকে স্টীমার পূর্ণবেগেই ছুটে চলেছে। ১৩ই তারিখে মোচা দৃষ্টিগোচর হল। ভগ্ন প্রাচীরে বেষ্টিত মোচার ধ্বংসাবশেষ, যেখানে সেখানে খেজুর কুঞ্জের ছড়াছড়ি। দূরে পাহাড়ের মাথায় কফির আবাদ।

মোচার পরেই বাবেলমাণ্ডের শেষ হল, এর পরেই পড়বে এডেন। স্টীমার পয়েন্ট পড়ে মাঝখানে, এখানে কয়লা নেবার জন্য থামতে হয়।

বোম্বাই এখন সাড়ে ষোলশো মাইল। কিন্তু ফগের চিন্তার কারণ নেই। এডেন পৌঁছোবার কথা ১৫ই সকালে। কিন্তু পৌঁছানো গেল ১৪ই সন্ধ্যায়, পনেরো ঘণ্টা আগে।

ফগ নামল পাসেপার্তুকে সঙ্গে নিয়ে। এদের অলক্ষ্যে নামল ফিক্সও। ফগ পাসপোর্টে ভিসা করাবে।

এডেন সুরক্ষিত বন্দর। এত সুরক্ষিত যে একে ভারত মহাসাগরের জিব্রাল্টার বলা হয়। কেল্লা-কামান ছাড়াও এতে দর্শনীয় পুরাকীর্তি আছে—রাজা সলোমনের চৌবাচ্চাগুলি। দু হাজার বছর আগের তৈরি। পাসেপার্তু দেখে অবাক হল—প্রাচীন যুগের চৌবাচ্চাকে আধুনিক যুগেও কাজে লাগাবার জন্য ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারেরা সেখানে কাজ করছে। "কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! দেশে দেশে না ঘুরলে কিছুই দেখা হয় না দেখছি"—ক্রমাগত বিড়বিড় করে পাসেপার্তু।

২০শে তারিখ দুপুরে মঙ্গোলিয়া বোম্বাই বন্দরে ভিড়ল। যদিও তার পৌঁছোবার তারিখ ছিল ২২শে। লণ্ডন থেকে বোম্বাই আসতে আসতেই দুটি দিন বাঁচিয়ে ফেলেছে ফিলিয়াস ফগ।

(৩)

বিকাল সাড়ে চারটায় মঙ্গোলিয়া পৌঁছোলো বোম্বাই বন্দরে। এলাহাবাদের ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা আটটায়।

পাসেপার্তুকে কয়েকটা জিনিস কিনতে পাঠাল ফিলিয়াস—বলে দিল—"ঠিক আটটায় স্টেশনে হাজির থাকা চাই।"

তারপর সে নিজে বেরুলো পাসপোর্ট আফিসের উদ্দেশে, ভিসা করাতে হবে। যাওয়া আর আসা; দেখবার মত, মনে করে রাখবার মত জিনিস শত শত আছে বোম্বাইয়ের আশেপাশে, সে সব কিছুই দেখল না ফিলিয়াস।

সিটি হল, লাইব্রেরি, কেল্লা, ডক, তুলোর বাজার, মসজিদ, ইহুদী মন্দির, আর্মেনিয়ান গির্জা, মালাবার-পাহাড়ের প্যাগোডা কোন কিছুই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। এলিফ্যান্টার গুহা বা সালসিটির শৈলবিহার—বৌদ্ধ যুগের অপরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন—কোন কিছু দেখে আসবার জন্য তার মন এতটুকু চঞ্চল হল না। পাসপোর্ট অফিস থেকে সে সোজা স্টেশনে ফিরে এল এবং স্টেশনের হোটেলে ফর্মাইস দিল ডিনারের। মামুলি সব খাবার যথাযথ পরিবেশন করে হোটেলওয়ালা এক রকম মাংসের খাবার নিয়ে এল—"খেয়ে দেখুন হুজুর, অতি চমৎকার জিনিস। আসল বুনো খরগোশের কাটলেট।"

খেতে আপত্তি নেই ফিলিয়াসের। শ্রদ্ধার সঙ্গেই খরগোসের কাটলেট চিবোতে শুরু করল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। এল হোটেলওয়ালা।

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিলিয়াস বলল—"এটা খরগোশ?"

"নিশ্চয় হুজুর!"

"খরগোশটাকে কাটবার সময় মিউ মিউ করে ডেকেছিল ত?"

"মিউ মিউ হুজুর! খরগোশে মিউ মিউ করবে? আমি দিব্যি গেলে বলছি হুজুর—"

"দিব্যি গালতে হবে না হোটেলওয়ালা। একটা কথা শুধু মনে রেখো—এককালে এই ভারতবর্ষে বিড়ালদের দেবতার বাহন বলে ভক্তি করা হত। কী সুখের দিন ছিল তখন!"

"বিড়ালদের পক্ষে হুজুর?"

"পর্যটকদের পক্ষেও বটে।"

তারপর কাটলেট বাদ দিয়ে অন্য খাবারে মনঃসংযোগ করল ফগ।

ইতিমধ্যে ডিটেকটিভ ফিক্সও মঙ্গোলিয়া থেকে নেমেছে। নেমেই সে ছুটেছে বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনারের আফিসে। সেখানে নিজের পরিচয় দিয়ে লণ্ডন থেকে বোম্বাই আগমনের কারণ বর্ণনা করেছে এবং জিজ্ঞাসা করেছে—ফিলিয়াস ফগের নামে কোন ওয়ারেণ্ট লণ্ডন থেকে এসেছে কিনা।

না, ওয়ারেণ্ট আসে নি। হিসাব করে দেখলে ফিক্স আগেই বুঝতে পারত যে এত তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব নয় ওয়ারেণ্ট। লণ্ডনে টেলিগ্রাম

করে দিয়েই তো ফিক্স স্টীমারে চেপেছে! পরের স্টীমার না আসা পর্যন্ত ওয়ারেণ্টের প্রত্যাশা করা যায় কেমন করে?

এত সব হিসাব করে দেখেনি অত্যুৎসাহী ফিক্স। আশাভঙ্গে তাই সে বড়ই মুষড়ে গেল। বোম্বাইয়ের কমিশনারকেই সে বলল একখানা ওয়ারেণ্ট বার করে দিতে। সে ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করলেন। ব্যাপারটা লণ্ডন পুলিসের নিজস্ব। তারা ছাড়া এ-ওয়ারেণ্ট কেউ বার করতে পারে না। ইংলণ্ডের আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে চিরদিনই অতিরিক্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কাজেই বিন্দুমাত্র স্বৈরাচার খাটাবার অবকাশ এর মধ্যে নেই। এটা বুঝে ফিক্সও জেদ করল না আর। অপেক্ষা তাকে করতে হবেই—লণ্ডন থেকে ওয়ারেণ্ট আসা পর্যন্ত।

অবশ্য ফিলিয়াস ফগও অপেক্ষা করবে এখানে—এই রকমই বিশ্বাস ফিক্সের। পাসেপার্তু'রও বিশ্বাস তাই ছিল। এ দৌড়ঝাঁপ আর কতদিন চলতে পারে? তাই হক, ফগও থাকুক, ফিক্সও থাকবে। নজরের বাইরে যেতে দেবে না আসামীকে।

হ্যাঁ, পাসেপার্তু'র বিশ্বাস তাই ছিল বটে। কিন্তু সে বিশ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে কর্পূরের মত। ট্রেনের টাইম আটটায়, তার আগেই স্টেশনে পৌঁছোবার হুকুম দিয়েছে মনিব। সুয়েজের মতই ধুলোপায়ে বিদায় হতে হবে এখান থেকে। অন্ততঃ কলকাতা পর্যন্ত তো যাওয়া হবেই, আরও দূরে যাওয়ারও আটক নেই। ওদিকে গ্যাসটা ক্রমাগতই জ্বলছে লণ্ডনের বাড়িতে।

বাজির কথাটা কি তাহলে সত্যি? পাসেপার্তু আগে তত বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এখন তো আর বিশ্বাস না করে পারা যাচ্ছে না। ভাগ্য তাদের টানছে—মনিব চাকর দু-জনকেই। তা না হলে দু দুটো শান্তিপ্রিয় লোক এভাবে পৃথিবীময় ছুটে বেড়াবে কেন?

কতকগুলো জামা জুতো কিনবার দরকার ছিল মনিবের জন্য, সে সব সংগ্রহ করে পাসেপার্তু দেখল হাতে যথেষ্ট সময়। ধীরে সুস্থে সে হাঁটতে লাগল শহরের রাস্তা দিয়ে। রাস্তায় অজস্র লোকের ভিড়, সে-ভিড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকও বিস্তর। তাছাড়া ফেজপরা ইরাণী,

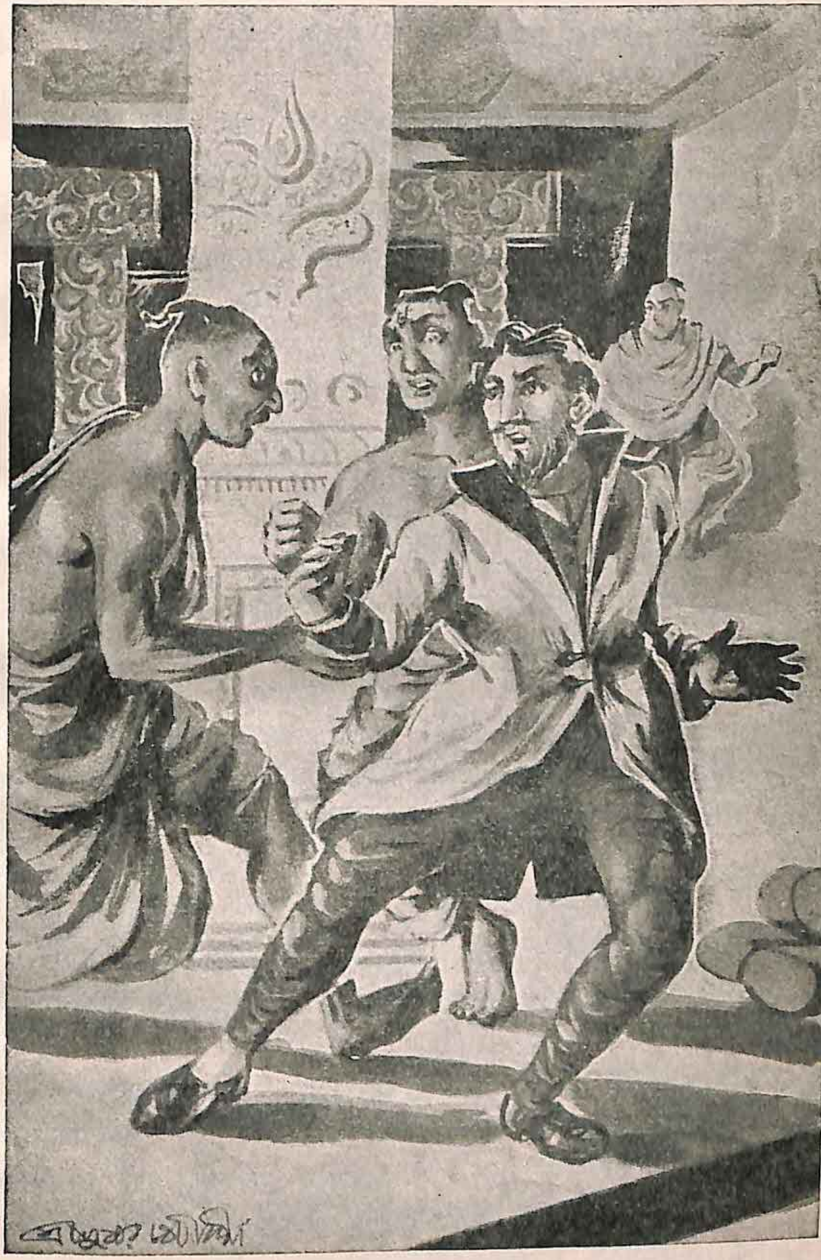
পাগড়িওলা বেনিয়া, চৌকো টুপিওলা সিন্ধী, ঝোলা পোশাক-পরা আর্মেনিয়ান, কালো লম্বা কোট-চড়ানো পার্শী—কী নেই সে ভিড়ের ভিতর ? পার্শীদের কী একটা উৎসব তখন হচ্ছে, মিছিল বেরিয়েছে তারই জন্য। সে-মিছিলে সোনালী রূপালী জরিদার গোলাপী মস্‌লিনের পোশাক-পরা নাচওয়ালীরা কী চমৎকার নৃত্য করছে নানা বাজনার তালে তালে! এই পার্শী মিছিলের জৌলুস যে কতক্ষণ মুগ্ধ করে রেখেছিল পাসেপার্তু কে, তার খেয়াল নেই বেচারীর। মিছিল চলে গেল। তখনও ওর সেই রকম বেহুঁশ দশা। হাঁটতে হাঁটতে এল মালাবার পাহাড়ে, প্যাগোডার সমুখ দিয়ে রাস্তা। কী জমকালো মন্দির। একবার দেখলে দশবার দেখবার সাধ হয়, বাইরেকার সৌষ্ঠব ভিতর দিকে টানে। টানল পাসেপার্তু কেও।

ছুটো জিনিস সে জানে না। প্রথমটা এই যে খ্রীষ্টানদের ও-প্যাগোডায় প্রবেশ নিষেধ। দ্বিতীয় নিষেধটা আরও মারাত্মক—ওখানকার পুরোহিত পূজারীরাও জুতো-পায়ে ভিতরে ঢুকতে পারে না। জানে না যখন, খ্রীষ্টান পাসেপার্তু জুতো-পায়ে গট গট করে ঢুকে পড়ল প্যাগোডাতে।

কত-বড় অপরাধ করে বসল নিজেরই অজান্তে, অভাগা তা জানবে কেমন করে ? ব্রিটিশ সরকার এ-জাতীয় অপরাধ ক্ষমা করেন না। যে-কোন ধর্মের লোক হক না, ভারতীয় প্রজাদের ধর্মবিশ্বাসে বিন্দুমাত্র আঘাত তাঁরা করতে দেন না কাউকে।

পাসেপার্তু মনের আনন্দে মন্দিরের আভ্যন্তরীণ কারুকলা দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় হঠাৎই তিনটে লোক এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর লাথির উপর লাথি। একজন তার জুতো মোজা টেনে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

প্রথমটা খুবই হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে পাসেপার্তু। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়োজন বুঝতে পেরে সে চাঙ্গা হয়ে উঠল। গায়ে তার জোর যথেষ্ট, তিনজন হলেও পুরোহিতেরা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারল না। প্রথমজনাকে এক ঘুষিতে এবং দ্বিতীয়কে এক লাথিতে ধরাশায়ী করে সে ছুটল বাইরের দিকে। তৃতীয় হিন্দু অবশ্য চিৎকার করতে করতে পিছু নিল তার। কিন্তু ঢিলে আখখাল্লার দরুন জোরে ছুটবার ক্ষমতা তার ছিল



হঠাৎ তিনটে লোক এসে পাসেপার্তুকে ধাক্কা দিল।

না। পাসেপার্তু তাকে অনেক পিছনে ফেলে রাস্তার ভিড়ের ভিতর মিশে গেল।

মাথায় টুপি নেই, পায়ে জুতো নেই—রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পাসেপার্তু যখন স্টেশনে পৌঁছালো, গাড়ি ছাড়তে তখন মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি। ফগ এসে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছে। তার একটুখানি পিছনে একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে আত্মগোপন করে আছে ডিটেক্‌টিভ ফিক্স।

ফিক্স বুঝতে পেরেছে যে আবার তার আশাভঙ্গ হবে। আসামী বোম্বাইতে থাকবে না। বেশ, না থাকুক, ফিক্স তাকে ছাড়ছে না, সেও যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতা পর্যন্ত তো বটেই, দরকার হলে তার পরেও।

পাসেপার্তু দেখেনি ফিক্সকে। মনিবকে দেখে নিজের লাঞ্ছনার কাহিনী সবিস্তারে তাকে জানাল। বলা বাহুল্য, কানটি বাড়িয়ে সবই শুনে নিল ফিক্স।

ফিলিয়াস ফগ শুধুমাত্র বলল—"দেখো যেন আর কখনও এমনটা না হয়।"—তার পরই একটা কামরায় উঠে আসন গ্রহণ করল সে। নগ্নপদ পাসেপার্তুও সসংকোচে সেই প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল নিয়ে চাপা দিল পায়ের উপর।

ফিক্সও উঠতে যাচ্ছিল ট্রেনে। কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় অন্য একটা দুষ্টবুদ্ধি যোগাল। "না, আমি এখন যাব না। কায়দায় পেয়েছি ওদের। ভারতের মাটির উপরে হিন্দুধর্মের অবমাননা। ওদের গ্রেফতার করবার একটা উপায় হয়েছে।"

হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। ঠিক সময়েই ছাড়ল।

অনেক যাত্রী গাড়িতে। সামরিক কর্মচারী, বেসামরিক কর্মচারী, আফিং বা নীলের কুঠিওয়ালা সবাইকেই পূর্ব ভারতে যেতে হচ্ছে নিজের নিজের কাজে।

ফগ আর পাসেপার্তুর সঙ্গে ওদের গাড়ীতে তৃতীয় একজন যাত্রী রয়েছেন সার ফ্রান্‌সিস ক্রোমার্টি। ইনিই সেই সহকারী সেনাপতি, যিনি মঙ্গোলিয়া জাহাজে তাস খেলতেন ফিলিয়াসের সঙ্গে। বেনারস পর্যন্ত এঁকে যেতে হবে, সেইখানেই এঁর সেনাদল রয়েছে ছাউনি করে।

সার ফ্রান্‌সিসের জন্ম ভারতেই। জীবনের অধিকাংশ কেটেছেও ভারতে। এদেশের সম্বন্ধে সব কিছুই তিনি জানেন। সহযাত্রী ফগের যদি

কোন কিছু জানবার জন্য কৌতূহল হত, আর ফ্রান্‌সিস তা অনায়াসেই তাকে জানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! ফগ যেন কৌতূহলশূন্য জীব। না হবেই বা কেন! দেশভ্রমণের জন্য সে বেরোয়নি, বেরিয়েছে পৃথিবীর চার পাশে একটা বৃত্ত আঁকবার জন্য। দ্রুতবেগে এগিয়ে যাওয়া এবং যেতে যেতে সময়ের হিসাব করা—এই দুটি ছাড়া অন্য কোন কাজ তার আপাততঃ নেই।

লোকটি যে সৃষ্টিছাড়া ধরনের, সেটা বুঝতে ক্রোমাটির মত বিচক্ষণ লোকের দেরি হয়নি। তাঁর মনে কেবল একটা প্রশ্ন—ফিলিয়াস ফগ নামক ঐ যে একটি সজীব যন্ত্র তাঁর সমুখে বসে আছে। ওর বাইরেকার অসীম ঔদাসীন্যের আড়ালে হৃদয় বলে কোন বস্তু আছে কি নেই? এমন একটা হৃদয়—যা অন্য সৎ মনুষ্যের হৃদয়ের মতই সাড়া দেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেদনে বা নৈতিক আদর্শের প্রেরণায়?

ফগের পৃথিবী পরিভ্রমণের পরিকল্পনার কথা অজানা নয় সার ফ্রান্‌সিসের, ফগই বলেছে তাঁকে। এই বাজিটাকে সার ফ্রান্‌সিস বিবেচনা করেছেন একটা অর্থহীন খেয়াল বলে। যুক্তিবাদী মনুষ্যের পক্ষে সে-রকম খেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হওয়া অনুচিত। যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে ফিলিয়াস ফগ, স্বল্প-পরিচিত বস্তুতান্ত্রিক এই সেনাপতির মতে—তাতে ফগের নিজের বা পৃথিবীর অন্য কারও কিছুমাত্র উপকার হবে না।

বোম্বাই থেকে ট্রেন ছাড়বার পরে এক ঘণ্টা কেটেছে। সালসিটি দ্বীপ পেরিয়ে কল্যাণ স্টেশনে পৌঁছোলো। এর পরই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, তার পাদদেশে অতল খদ, মাথার উপরে নিবিড় বনানী।

থেকে থেকে দুই একটা কথা সার ফ্রান্‌সিস আর ফিলিয়াস ফগের ভিতর। ফ্রান্‌সিস বলছেন—"কয়েক বৎসর আগে হ'লে এই জায়গায় এসে এমন দেরি হত যে আপনার বাজি জিতবার আর আশা থাকত না।"

"কেন বলুন ত?"

"এই পাহাড়ের উপর দিয়ে তখন রেলপথ হয়নি। পালকি করে বা ঘোড়ায় চড়ে যেতে হত ওপারের কাণ্ডালা স্টেশন পর্যন্ত।"

"ও-রকম একটু-আধটু গোলযোগে কি আর বৃহৎ ব্যাপার থম্‌কে থাকে? আগে থাকতে তার ব্যবস্থা করে রাখা হত নিশ্চয়।"

"কিন্তু, মিস্টার ফগ। আপনার এই ভৃত্যটি আজ যা কীর্তি করে এল,

তাতে করে খুব বড়-রকম গোলযোগে আপনার জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। তার কি ব্যবস্থা করছেন?"

পাসেপার্তু তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মনিবেরা যে তার সম্বন্ধেই কথা কইছেন, তা সে স্বপ্নেও জানতে পারছে না।

ফগ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী রকম বড় গোলযোগ হতে পারে?"

"কারও ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ব্রিটিশ সরকার সহ্য করেন না। হিন্দুদের ধর্মীয় রীতি পদ্ধতি যাতে ষোল-আনা মর্যাদা পায় সেদিকে তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি—। আপনার ভৃত্যকে যদি ওরা ধরতে পারত—"

ফগ নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল—হাঁ, ও যদি ধরা পড়ত, ওর সাজা হত। জেল হত। জেল খাটবার পর নিঃশব্দে ও ইওরোপে ফিরে যেত। তাতে তার মনিবের দেরি বা অসুবিধা হবে কেন, তা তো বুঝতে পারছি না।"

রাত্রির ভেতরেই ট্রেন ঘাট পর্বত পেরিয়ে নাসিক পৌঁছে গেল এবং সেখান থেকে পরদিন ছুটে চলল খান্দেশ প্রদেশের সমতল ভূমির ওপর দিয়ে। চারিদিকে সুন্দর চাষবাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, তাদের মাথার ওপর কোথাও হিন্দু-মন্দিরের, কোথাও বা খ্রীষ্টান-গির্জার চূড়া। ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে গোদাবরী নদীতে আত্মসমর্পণ করবার জন্য। তাদেরই জলে গোটা অঞ্চলটা সরস।

পাসেপার্তুর ঘুম ভাঙ্গল। নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারে না। সত্যিই কি সে হিন্দুদের দেশের বুকের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি হাঁকিয়ে অজানার দিকে ছুটে চলেছে? হাঁ, চলেছে যে, তাতে ভুল নেই। এঞ্জিন চালাচ্ছে এক ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার। কয়লা যুগিয়েছে ইংরেজ কোম্পানি, আর এঞ্জিনের ধোঁয়া ভক্‌ভক্ করে আকাশে উঠে কালোয়-কালো করে দিচ্ছে, হিন্দুস্থানের তুলোর আবাদ, কফি, লবঙ্গ আর লঙ্কা-মরিচের যোজন-জোড়া ক্ষেতগুলিকে। তালকুঞ্জের মাথায় মাথায় পাক খাচ্ছে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আর তার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে, এখানে ওখানে বাংলোবাড়ি ভাঙ্গা মঠবাড়ি আর আশ্চর্য রকম জমকালো হিন্দুমন্দির।

তারপর দিগন্তবিস্তৃত সব শ্যামল প্রান্তর, সাপেশার্দূলে ভয়ংকর সব অরণ্যানী এবং শেষ পর্যন্ত এক অন্তহীন প্রায়ান্ধকার বনরাজ্য যার বক্ষঃভেদ করেই অগ্রসর হয়েছে এই দুঃসাহসী রেলপথ। লাইনের দু পাশে

মাঝেমাঝেই দেখা যায় দলবদ্ধ বুনো হাতি। তারা কুতকুতে চোখ দিয়ে ধাবমান রেলগাড়ির দিকে শুধু নিঃশব্দে তাকিয়েই থাকে।

মালিগাঁও স্টেশন। এর পর থেকেই গোটা অঞ্চলটা ঠগেদের রাজ্য। ওদিকে ইলোরার গুহামন্দিরসমূহ, এদিকে বাদশা ঔরংজেবের শেষ বয়সের রাজধানী ঔরঙ্গাবাদ—মাঝখানে বিস্তৃত এই সম্পূর্ণ প্রদেশটাতেই দীর্ঘদিন ধরে যে-লোক দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছে, সে কোন মুকুটধারী রাজা নয়, শুধু একটা দস্যুমাত্র। ঠগ সর্দার ফিরিঙ্গী। মৃত্যুদেবতার উপাসক এই ঠগেরা, লক্ষ লক্ষ দস্যু এদের দলে! এদের দেবীর তৃপ্তির জন্যই না কি এরা নরহত্যা করে। অস্ত্রাঘাতে নয়, গলায় ফাঁস লাগিয়ে। এমন এক সময় ছিল, যখন এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমন এক ফুট জায়গা ছিল না কোথাও, যেখানে মাটি খুঁড়লেই মানুষের মৃতদেহ না বেরুত! ঠগেদের শিকার এরা। ইংরেজ সরকার এদের অত্যাচার অনেক কমিয়ে এনেছেন বটে। কিন্তু এদের দলবল এখনও বর্তমান আছে এবং আগের চেয়ে একটু সতর্কভাবে কাজ চালাতে বাধ্য হলেও, এখনও ব্যাপকভাবেই তাদের পৈশাচিক বৃত্তি অনুসরণ করে যাচ্ছে।

সাড়ে বারোটার সময় বুরহানপুরে থামল গাড়ি। স্টেশনে একজোড়া দেশী চটি কিনে তাতে নগ্নচরণ ঢোকাল পাসেপার্তু। চটির ওপর ঝুটা মুক্তা বসানো, পাসেপার্তুর মনে রীতিমত দেমাক এসে গেল চটি পায়ে দিয়ে। সবাই তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিল, তারপর এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল তাপ্তী নদীর শোভা। কাম্বে উপসাগরের দিকে বয়ে চলেছে—শীর্ণা তাপ্তী, বিখ্যাত বন্দর সুরাট এই কাম্বের উপকূলেই অবস্থিত।

ট্রেনে বসে বসে খুবই চিন্তাকুল পাসেপার্তু। বোম্বাইয়ের হিন্দুমন্দিরে যে বোকামি সে করে এসেছে, তার দরুন মনিবের কোন অসুবিধা হবে না তো? নিজেকে কত রকম ভাবে যে তিরস্কার করেছে বেচারী! বাজিটা জেতার পথে কোন অন্তরায় যদি তারই আচরণের দরুন ঘটে যায় তাহলে তো নিজের জীবন দিয়েও সে ক্ষতি সে পূরণ করতে পারবে না।

পাসেপার্তুর চিন্তাধারার ভেতর অলক্ষ্যে একটা পরিবর্তন এসে গিয়েছে। আগে সে প্রতি মুহূর্তে প্রার্থনা করছিল যে এই অর্থহীন ছুটোছুটি বন্ধ হক। বোম্বাই পর্যন্ত। কিন্তু তারপর থেকেই সে অন্যরকম ভাবতে শুরু করেছে। বোম্বাইতেও যখন মনিব থামলেন না, তখন

এ-ঘোড়দৌড়ের একটা অর্থ আছে হয়ত। হয়ত বাজির ব্যাপারটাও ভুয়া নয়। তা যদি না হয়, তা হলে তো পাসেপার্তুর কর্তব্য হচ্ছে প্রভুর প্রচেষ্টার সাফল্যই কামনা করা! যাতে গতিবেগে ভাটা না পড়ে, এখন থেকে তো তাই দেখা উচিত পাসেপার্তুর।

ট্রেনটা এত ঘন ঘন থামছে কেন? মঙ্গোলিয়া জাহাজের মত একটানা ছুটবার পক্ষে এর বাধা কোথায়? কত সময় যে নষ্ট হচ্ছে স্টেশনে স্টেশনে! মিস্টার ফগ মঙ্গোলিয়ার এঞ্জিনিয়ারকে ঘুষ দিয়ে বশ করতে পেরেছিলেন। আর এই রেলগাড়ির এঞ্জিনিয়ারের বেলায় তাঁর বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেল?

স্টীমারের উপর যা সম্ভব, রেলগাড়িতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু পাসেপার্তু তা জানবে কেমন করে? ওর অভিজ্ঞতা স্টীমার সম্বন্ধেও যতটুকু, রেলগাড়ি সম্বন্ধেও ততটুকু।

সন্ধ্যার কাছাকাছি গাড়ি সাতপুরা পর্বত পেরুলো। খান্দেশ অতিক্রম করে বুন্দেলখণ্ডের এলাকায় প্রবেশ করল ওরা।

পরের দিন, ২২শে অক্টোবর—সকালবেলায় পাসেপার্তু ঘড়ি বার করে দেখে, তিনটে বেজেছে। তিনটের সময় রোদ্দুর উঠছে দেখে সে বিস্ময় প্রকাশ করল। সার ফ্রান্সিস বললেন—"তোমার ঘড়িতে বুঝি লণ্ডনের সময় রেখেছ এখনও? আসলে বেলা এখনও সাতটা।"

"কী করে হবে?" তর্ক তোলে পাসেপার্তু।

সার ফ্রন্‌সিস তাকে বোঝাতে শুরু করেন—"আমরা ক্রমাগত পুবদিকে, অর্থাৎ সূর্যের মুখোমুখি এগিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর আয়তনটা তিনশো ষাট ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এক ভাগের নাম এক ডিগ্রী। ক্রমাগত পুবদিকে চললে এক এক ডিগ্রীতে দিনটা চার মিনিট ছোট হবে।" ইত্যাদি অনেক কথা তিনি পাসেপার্তুকে বললেন—ঠিক যেভাবে এর আগে একদিন বলেছিল ডিটেকটিভ ফিক্স। পাসেপার্তু ফিক্সের কথাতেও কর্ণপাত করে নি, এখন সার ফ্রান্‌সিসের কথাতেও করল না।

হতাশ হয়ে সার ফ্রান্‌সিস বললেন—"তুমি ঘড়ির কাঁটা ঘোরাবে কিনা, সেটা তোমার মর্জি। কিন্তু না ঘোরালে তোমার ঘড়ি ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়বে। দেখছই তো, ইতিমধ্যে চার ঘণ্টা তফাত হয়ে গিয়েছে।"

সকাল আটটার সময় রোথালের পনেরো মাইল আগে ট্রেন হঠাৎ থেমে

পড়ল। মহারণ্যের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা একদম ফাঁকা। সেখানে কয়েকখানা বাংলোবাড়ি এবং অনেকগুলি কুঁড়েঘর।

ট্রেনের গার্ড গাড়ির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত হেঁটে গেল। নীরবে নয়, চিৎকার করে একটা কথা বলতে বলতে। কথাটা হল এই—"যাত্রীরা নেমে পড়ুন। যাত্রীরা নেমে পড়ুন।"

(৪)

ফিলিয়াস ফগ তাকাল সার ফ্রান্সিসের দিকে, সার ফ্রান্সিস তাকালেন অদূরবর্তী বট তেঁতুলের জঙ্গলের দিকে। এই জঙ্গলের মাঝখানে যাত্রীদের নেমে যেতে বলছে, এর চেয়ে রসিকতা আর কী হতে পারে?

পাসেপার্তু ততক্ষণে নেমে পড়েছে এবং লাইন ধরে দৌড়ে গিয়েছে সমুখপানে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল এবং এসেই বলল—"হুজুর! রেল-লাইনই নেই আর!"

"আরে, বল কি?"—বলেন সার ফ্রান্সিস।

"বলি যে গাড়ি আর এগুবার কোন উপায় নেই।"

সেনাপতি মশাই তক্ষুনি ট্রেন থেকে নামলেন। ধীরে সুস্থে নামল ফগও। দুজনে গিয়ে গার্ডকে ধরল—

"আমরা এ কোথায় এসেছি?"

"খোলবি গ্রামে।"

"এখানে থামতে হবে?"

"নিশ্চয়। রেলপথটাই তৈরী হয় নি আর।"

"কী রকম? তৈরী হয় নি?"

"না। এইখান থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এই যে পঞ্চাশ মাইল পথ—এটা তৈরী হতে বাকী আছে এখনো। এলাহাবাদ থেকে আবার লাইন আছে, ট্রেনও পাবেন।"

"কিন্তু কাগজে যে লিখেছিল—সমস্ত লাইনটাই তৈরী হয়েছে?"

"ভুল লিখেছিল তারা।"

"কিন্তু আপনারা তো বোম্বাই থেকে কলকাতা পর্যন্ত টিকিট বিক্রি করছেন?"—সার ফ্রান্সিসের মেজাজ গরম হয়ে উঠছে।

কিন্তু গার্ড নির্বিকার—"কেন দেব না? যাত্রীরা তো জানেই যে খোলবি থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এটুকু তাদের অন্য যানবাহনে যেতে হবে।"

সার ফ্রান্সিস রেগে আগুন। পাসেপার্তু তো গার্ডকে এই মারে তো এই মারে! অবিচলিত শুধু ফিলিয়াস ফগ। সে ধীর ভাবে বলে—"আসুন, সার ফ্রান্সিস, অন্য উপায়ে এলাহাবাদ পৌঁছোবার একটা ব্যবস্থা দেখা যাক।"

সার ফ্রান্সিস সমবেদনার সুরে বলেন—"মিস্টার ফগ, এই দেরিতে আপনার বাজিটা মারা গেল।"

"মোটেই না। এসব আগেই ভেবে রেখেছি।"

"কী রকম? আপনি জানতেন না কি যে রেলপথটা—"

"না, তা জানতাম না। তবে এটা ঠিকই জানতাম যে কোন-না কোন সময় পথে আমার বাধা পড়বেই। এখন পর্যন্ত আমার দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ ঘটে নি। আরব সমুদ্রেই আমি দুটো দিন বাঁচিয়েছিলাম, কাজেই দু দিন এখন যদি লোকসান হয়, তাতেও আমার মোটের উপর অসুবিধা হবে না। কলকাতা থেকে একটা স্টীমার হংকং যাচ্ছে ২৫শে দুপুরে। আজ সবে ২৩শে; আমি কলকাতায় ঠিক সময়েই পৌঁছে যাব দেখবেন।"

যে লোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত সুনিশ্চিত, তাকে আর কী বলা যায়?

এদিকে এরা যতক্ষণ গার্ডের সঙ্গে ঝগড়া করছে, অন্য যাত্রীরা ততক্ষণে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। তারা প্রায় সকলেই জানত যে খোলবি থেকে এলাহাবাদ লাইন নেই। তাই, গাড়ি থামামাত্র চটপট নেমে গিয়ে গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়েছে তারা এবং সেখানে চার চাকার পালকি-গাড়ি, দু-চাকার জেবুর* গাড়ি, চুড়াওয়ালা রথ, পালকি, টাট্টু—যে যা পেয়েছে—ভাড়া করে নিয়ে চটপট নেমে পড়েছে এলাহাবাদের পথে।

কাজেই ফগ আর সার ফ্রান্সিস যখন গ্রামে ঢুকলেন, তখন সেখানে যান বা বাহন বলতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

ফগ দমবার লোক নয়। "তা হলে হেঁটেই যাব।"

---

* জেবু একরকম কুঁজওয়ালা ষাঁড়।

পাসেপার্তু এতক্ষণ কোথায় ছিল, কে জানে। এইমাত্র সে ফিরে এসে মনিবের পেছনে দাঁড়িয়েছে। হেঁটে যাওয়ার কথা শুনেই সে মুখ বিকৃত করল। আপনা থেকেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পায়ের শৌখিন চপ্পলের ওপরে—নকল মুক্তোর জৌলুসে যা জ্বলজ্বল করছে। এই পাদুকা পায়ে দিয়ে পঞ্চাশ মাইল হাঁটা ?

যা হক, সে এক পা এগিয়ে এসে বলল—"হুজুর, একটা উপায় বোধ হয় হতে পারে।"

"উপায় ? কী উপায় ?"

"হাতি দেখে এলাম একটা।"

"চল, দেখি।"

তিনজনেই চলে গেল প্রায় গ্রামের বাইরে। মোটা মোটা কাঠের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় পাসেপার্তু থামল গিয়ে। ডাকাডাকি করতেই একটা লোক বেরিয়ে এল।

আগে কোন কথা না বলে ঘেরার ভেতর ঢুকে পড়ল ফগ এবং তার সঙ্গীরা। ঘেরার ভেতর একটা প্রকাণ্ড হাতি।

"হাতিটা ভাড়া দেবে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য ?"—ফগের প্রশ্ন বিনা ভূমিকায় ! এবং হাতির মালিকেরও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব "না" – বিনা দ্বিধায়।

"ঘণ্টায় দশ পাউণ্ড ভাড়া দেব—"

"না। আমার হাতি ভাড়া খাটে না। আমি ওকে সার্কাসের জন্য তৈরি করছি। জানেন ওকে রোজ কতখানি করে মাখন মিছরি খাওয়াতে হয় ? ভাড়া খাটা জানোয়ারের তেজ কমে যায়।"

"ঘণ্টায় বিশ পাউণ্ড"—

"না"

"ঘণ্টায় চল্লিশ পাউণ্ড"—

এক একবার দাম চড়ছে, আর পাসেপার্তু লাফ মারছে এক একটা। হাতির মালিক চঞ্চল হয়েছে। পঞ্চাশ মাইল যেতে আসতে কত আর সময় লাগতে পারে ? খুব বেশী হয়ত, পনেরো ঘণ্টা লাগুক ! চল্লিশ পাউণ্ড হিসেবে পনেরো ঘণ্টায় ছয়শো পাউণ্ড ! অনায়াসে, অকারণে বসে বসে—এক দিনের ভেতর ছয়শো পাউণ্ড, দেশী টাকায় নয় হাজার টাকা ! লোকটা চঞ্চল হয়েছে। কিন্তু তবু সে আবারও বলল—"না"—

আরও বেশী পাওয়ার লোভ বোধ হয়।

সার ফ্রান্সিস ফগের কানে কানে বলছেন—"আর দাম চড়াবেন না।" "কিন্তু আমার তো যেতেই হবে!"—এই বলে ফগ হাতির মালিককে বলল—"শোন। ভাড়া খাটলে হাতির তেজ কমে যাবে, সার্কাস পার্টি ও হাতি আর নেবে না—এই জন্যই তো তুমি দিতে চাইছ না? তা বেশ, তোমাকে আর ভাড়া দিতে হবে না, তুমি হাতিটা বিক্রি কর। কত চাও।"

"কত চাইব? আপনি হাজার পাউণ্ড দিতে চাইলেও আমি হাতি বেচব না।"

"যদি দু হাজার পাউণ্ড দিতে চাই?"

হাতিওয়ালা এবারে একেবারে কুপোকাত। একটা হাতির দাম দু-হাজার পাউণ্ড? ত্রিশ হাজার রূপেয়া?

আর সে "না" বলতে পারল না। গলা দিয়ে সরল না শব্দটা।

হাতি তো কেনা হল, এখন দরকার মাহুত। সেটা তেমন শক্ত হল না। এক পার্শী যুবককে পাওয়া গেল, সে মাহুতের কাজ জানে, বিশেষ করে সে এই হাতিটার পরিচিত। হাতির মালিকের কাছে প্রায়ই যাতায়াত থাকায় হাতির সঙ্গেও সে ভাব জমিয়ে রেখেছে।

ছেলেটি বুদ্ধিমান, চটপটে এবং ভদ্র। তার মজুরি ঠিক হল—ঘণ্টায় এক পাউণ্ড। এবং প্রচুর পুরস্কার, যদি অতি শীঘ্র সে এলাহাবাদ পৌঁছোতে পারে।

হাতির পিঠের ওপর দিয়ে একটা বড় কাপড় দুদিকে ঝুলিয়ে দিল মাহুত, তারপর শিরদাঁড়ার দুদিকে বেঁধে দিল দুটো কাঠের হাওদা। একটা হাওদাতে বসল ফগ, অন্যটাতে সার ফ্রান্সিস। ফগেরই অনুরোধে সার ফ্রান্সিস তার সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছেন।

পাসেপার্তু আসন নিল দু হাওদার মাঝখানে। আর মাহুত বসল হাতির ঘাড়ের ওপরে।

ঠিক বেলা নটায় হাতি চলতে আরম্ভ করল।

রাস্তা ছেড়ে দিয়ে মাহুত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলল। রাস্তা এগিয়েছে পাহাড়গুলোকে বেড় দিয়ে দিয়ে, কাজেই তাতে যাওয়া মানেই হচ্ছে ঘুরপথে যাওয়া।

পার্শী যুবকটি এ-অঞ্চলের বনজঙ্গল খুব ভালরকমই চেনে। সে বলল জঙ্গলের পথ ধরলে দূরত্বটা সে অন্ততঃ কুড়ি মাইল কমিয়ে আনতে পারবে।

হাতির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর। হাওদার ভেতরে দু-জন আরোহীর অবস্থাই করুণ। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি ক্রমাগত। হাওদার ওপরে কদাচিৎ তাদের মাথা দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে কম।

কিন্তু এদের অবস্থা যদি করুণ হয়, তবে পাসেপার্তুর অবস্থা হাস্যকর। হাতির দোলানিতে একবার সে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, আর একবার উলটে পড়ছে পেছন দিকে। আর যতবারই পড়ছে, হেসে উঠছে খলখল করে। যখন পড়ছে না, তখন দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে তার—সশব্দে। ফিলিয়াস বলল—"জিভটা সাবধান, গলার ভেতর লুকিয়ে রাখ, তা নইলে দুই পাটি দাঁতের ভেতর পড়ে কচ্ করে কেটে যাবে।"

"কিউনি, কিউনি!" বলে ডাক দিয়ে পাসেপার্তু একতাল মিছরি বার করল ঝোলা থেকে।

অমনি সেই অতিকায় হাতিটা (ওরই নাম কিউনি) শুঁড় উঁচু করে পেছন পানে হেলিয়ে দিল, টুক্ করে মিছরির টুকরোটা তুলে নিল পাসেপার্তুর হাত থেকে। এর জন্য এক সেকেণ্ডের জন্যও তার গতিবেগ সে এক তিলও কমানোর দরকার দেখল না।

দু ঘণ্টা এক দৌড়ে চলবার পরে পার্শী মাহুত হাতিটাকে বিশ্রাম দিল একটু। নিকটবর্তী পুকুর থেকে একপেট জল খেয়ে এসে কিউনি গাছের ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে লাগল। সার ফ্রান্সিস বেঁচে গেলেন বিশ্রাম পেয়ে। তিনি হাড়ে হাড়ে শ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু ফগ? সে হাওদা থেকে বেরিয়ে এল—ঠিক যেন দীর্ঘ নিদ্রার পরে বিছানা ছেড়ে উঠে আসছে।

সেনাপতি অবাক হয়ে বললেন—"ভদ্রলোকের দেহ লোহায় গড়া।"

পাসেপার্তু তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়ার যোগাড় করে ফেলল। খোলবিতে খাওয়ার সময় পাওয়া যায় নি।

ঠিক দুপুরে মাহুত বলল—"উঠুন এইবারে।" ও হল একাধারে মাহুত ও পথপ্রদর্শক।

চার ধারের জঙ্গল ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর। অবশ্য মাঝে মাঝে এক একটা ফাঁকা মাঠ পাওয়া যাচ্ছে - তার ভেতর শুধু কাঁটাগাছের ঝোপ আর এখানে ওখানে পাথরের চাঙ্গ। বুন্দেলখণ্ডের এই অংশে বাইরের

লোক খুব কম আসে। এখানকার অধিবাসীরা গোঁড়া হিন্দু, ধর্মের বা প্রথার খাতিরে অমানুষিক নৃশংসতাও তারা অকাতরে করে থাকে। এখানে ব্রিটিশ-রাজের শাসন প্রসার লাভ করে নি, স্থানীয় রাজাই হর্তা-কর্তা। বিন্ধ্যপর্বতের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তারা ব্রিটিশ-সিংহকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে কোনই অসুবিধা বা আশঙ্কা বোধ করে না।

ওরা বিন্ধ্যপর্বতের শেষ সানুদেশ থেকে নামছে। কিউনি চলেছে দ্রুত তালে। কালিঞ্জর গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা। গঙ্গার উপনদী কালি, তারই তীরে এই গ্রাম। লোকালয়ে একবারও প্রবেশ করছে না মাহুত। লোকালয়ের চেয়ে জঙ্গলে-ঘেরা বালুচরগুলিই নিরাপদ মনে হয় তার। গঙ্গার আদিম শুকনো খাতগুলিই এখন বালুচরে পরিণত হয়েছে।

এলাহাবাদ আর বারো মাইলও নয়। উত্তর-পূর্বে কিউনির গতি। সামনে পড়ছে বড় বড় কলাবাগান। পাকা পাকা কলা, রুটির মত পুষ্টিকর, ক্ষীরের মত উপাদেয়! খেয়ে মানুষ জানোয়ার সবাই তৃপ্তি পেলো।

বেলা দুটো যখন, হাতিটা কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব দেখাতে লাগল। কী হল আবার? এ যাবৎ কোন বিপদ-আপদ ঘটেনি পথে, যা এই বিজন জঙ্গলে নিশ্চয়ই ঘটতে পারত। বাকী পথটুকুও নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারা যাবে বলে যখন সবাই আশা করছে, তখন হঠাৎ এ আবার কিসের আভাস? হাতির মত বুদ্ধিমান জীব তো বিনা কারণে চঞ্চল হবে না!

হাওদা থেকে মাথা তুলে সার ফ্রান্সিস বললেন—"হয়েছে কী?"

দূর থেকে একটা পাঁচমিশেলী কোলাহল কানে আসছে যেন। পার্শী জবাব দিল—"বুঝতে তো পারছি না হুজুর!"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাঁচমিশেলী কোলাহল একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করল। এখনও বেশ কিছু দূরে আছে বটে, কিন্তু গোলমালটা বহু মানুষের কণ্ঠস্বরের, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের কণ্ঠ আর বাজনার শব্দ।

পার্শী লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। ঘন জঙ্গলের ভেতর হাতি বেঁধে রেখে ছুটে চলে গেল ঝোপঝাড় ভেঙ্গে। কয়েক মিনিট পরেই সে ফিরে এল—"ব্রাহ্মণদের মিছিল একটা। যাতে আমাদের দেখতে না পায়, তারই চেষ্টা করতে হবে।"

হাতি খুলে জঙ্গলের আরও গভীরে সে ঢুকল। আরোহীদের নিষেধ করল নামতে। নিজে কাছেই রইল। পালাবার দরকার বুঝলে টক্ করে হাতিতে উঠে ছুট লাগাবে। তবে তার আশা আছে—বামুনেরা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। এত দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর কারা লুকিয়ে আছে—নজরে আসবে না তাদের।

বহু বহু কণ্ঠের বেসুরো আওয়াজ, আর বহু বহু যন্ত্রের বেতালা বাজনা—একত্র মিলে এক কর্ণবিদারী অট্টরোল। ক্রমেই নিকটবর্তী। ঢোল আর করতালের শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে একটা একটানা মন্ত্রগান। মিছিলের অগ্রভাগ ক্রমশঃ দেখতে পাওয়া গেল। জঙ্গল ভেদ করে ওরা এগিয়ে আসছে। ফগ এবং তার সঙ্গীরা যেখানে লুকিয়ে আছে, তার পঞ্চাশ ফুট দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা। এই অভিনব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কীরকম সব অদ্ভুত লোক অংশগ্রহণ করেছে, তা দেখবার সুযোগ এল ফগদের।

প্রথম লাইনে একদল পুরোহিত—মাথায় পাগড়ি, গায়ে সোনালী রূপোলী জরিদার ঢিলেঢালা জোব্বা। তাদের আশে পাশে পুরুষ, নারী, শিশু অনেক। সম্মিলিত কণ্ঠে সবাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র আওড়াচ্ছে। আর তারই মাঝে মাঝে এক একবার বেজে উঠছে—করতালের ঝনঝন আওয়াজ। তাদের পেছনে আসছে প্রকাণ্ড চাকা-ওয়ালা একখানা রথ। দামী কাপড়ের সাজপরা দু-জোড়া বৃহৎ জেবু সেই রথ টেনে নিয়ে আসছে। সেই রথে এক অতিকায় চতুর্ভুজ মূর্তি।

সার ফ্রান্‌সিস চুপি চুপি বললেন—"মূর্তিটা চিনেছি। কালীদেবী।"

মূর্তিকে বেষ্টন করে একদল বুড়ো সন্ন্যাসী ক্রমাগত লাফাচ্ছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে, তাদের গায়ে এখানে ওখানে ছুরির আঘাতের ক্ষত, সেই সব ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। আঘাতগুলি ওদের নিজেদের হাতেই করা।

এদেরও পেছনে আবার একদল ব্রাহ্মণ, তারা একটি নারীকে নিয়ে আসছে টানতে টানতে। মেয়েটির দাঁড়াবার শক্তিও আছে বলে মনে হয় না।

অতি ফরসা এই মেয়েটি, যে কোন ইওরোপীয় মহিলার মতই ফরসা। মাথায় গলায় কানে, হাতে বাহুতে পায়ে সর্বত্রই হীরে মুক্তোর অলংকার। সোনার কাজ-করা মসলিনের পোশাক তার পরিধানে।

মেয়েটির পেছনে আসছে খোলা তরোয়াল হাতে একদল সৈনিক আর একখানা জমকালো খোলা পালকি। পালকির ওপর শোয়ানো একটি শব।

এক বৃদ্ধের শব। রাজপোশাকে সুসজ্জিত। তার পাগড়িতে মুক্তোর মালা জড়ানো জামার রেশমী কাপড় স্বর্ণ-খচিত, তরোয়ালের বাঁটের ওপর বড় বড় হীরা।

এদের পরে আসছে বাদ্যকরেরা এবং ধর্মোন্মাদ গেঁয়ো লোকদের একটা উচ্ছৃঙ্খল জনতা, যাদের চিৎকারে বাজনার শব্দও ডুবে যাচ্ছে বারেবারে।

সার ফ্রান্‌সিস এই মিছিলের সমারোহ খুব বিষণ্ণভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন, এইবার পার্শীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"সতী, না ?"

মাথা নেড়ে সায় দিল পার্শী এবং ঠোঁটে আঙ্গুল তুলে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করল সাহেবকে। মিছিল তখনো পেরিয়ে যায় নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের আড়ালে। কোলাহল ক্রমে অস্পষ্ট থেকে আরও অস্পষ্ট হয়ে এল, অবশেষে নিবিড় স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল বনভূমিতে।

"সতী কী ?"—জিজ্ঞাসা করল ফিলিয়াস ফগ।

সেনাপতি বলতেন—"সতী, মিস্টার ফগ, এক রকমের নরমেধ। তবে স্বেচ্ছাকৃত নরমেধ। ঐ যে স্ত্রীলোকটিকে দেখলেন, কাল সকালে ওকে পুড়িয়ে মারা হবে।"

"কী পৈশাচিক !"—চেঁচিয়ে ওঠে পাসেপার্তু।

"আর ঐ মৃতদেহটা ?"—জিজ্ঞাসা করে ফগ।

"ও-দেহটা হল ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীর। স্বামীটা এই বুন্দেলখণ্ডের এক স্বাধীন রাজা।"

ফগের মনে যদি বা কোন উত্তেজনা এসে থাকে, কণ্ঠস্বরে তার একটুও আভাস ফুটে উঠছে না—সে বলল—"ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরেও এসব বর্বর প্রথা লুপ্ত হয় নি, এটা কেমন কথা ?"

সার ফ্রান্‌সিস উত্তর দিলেন—"ভারতের বেশির ভাগ জায়গায়, যেখানে যেখানে আমাদের আধিপত্য আছে, এরকম ব্যাপার আর ঘটতে পারে না। কিন্তু এই সব অরণ্য প্রদেশের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। বিন্ধ্য-পর্বতের উত্তর সানু খুন জখম আর ডাকাতির জন্য কুখ্যাত।"

পাসেপার্তু কেবলই বিড় বিড় করছে—"কী দুর্ভাগিনী ওই নারী! জ্যান্ত পুড়ে মরবে?"

সেনাপতি বললেন—"পুড়ে মরাটা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু পুড়ে না মরলেও ওর বরাতে দুর্ভাগ্য কম হবে না। ওর নিকট আত্মীয়েরাই ওর জীবনকে যন্ত্রণায় দুর্বহ করে তুলবে। ওর মাথা মুড়িয়ে দেবে। এক মুঠি ভাতও দিনান্তে দেবে কি দেবে না। কাছে ঘেঁষতে দেবে না ওকে, বলবে—ও অপবিত্র। এই ভাবে কিছুদিন বেঁচে থাকার পর অবশেষে একদিন এক কোণে পড়ে রোগা কুত্তার মত মরে পড়ে থাকবে। এ-রকম ভাবে জীবন ধারণের চাইতে তাই অনেক বিধবা মেয়ে পুড়ে মরাকেও বাঞ্ছনীয় মনে করে। কখনও কখনও সতীরা স্বেচ্ছাতেও সহমরণে যায় বটে, কিন্তু তার কারণ ওই।"

পার্শী লোকটি মাথা নেড়ে বলল—"কিন্তু এই যে সহমরণটা হতে যাচ্ছে, এটা কোনমতেই স্বেচ্ছামরণ নয়।"

"তুমি জান কি করে?"—ফগ এবং ফ্রান্সিসের এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা।

"বুন্দেলখণ্ডে এ কথা না জানে কে?"

"কিন্তু মেয়েটি তো পালাবার কোন চেষ্টা করছে না বা কাঁদছে না!"

"ওর কি জ্ঞান আছে? গাঁজা আরে আফিমের ধোঁয়া দিয়ে ওকে বেহুঁশ করে রাখা হয়েছে।"

একটা ঘোর বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল এদের।

"কিন্তু ওকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?"—অবশেষে জিজ্ঞাসা করে ফগ।

"এখান থেকে দুই মাইল দূরে পিলাজির মন্দির আছে, সেখানে। সেই খানেই মেয়েটা রাত কাটাবে। কাল সকালে সতীদাহ।"

"কখন হবে ওটা?"

"রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে।"

এই কথা বলেই হাতিটাকে জঙ্গল থেকে বাইরে নিয়ে এল পার্শী। শুঁড় বেয়ে তার কাঁধের উপর উঠে বসল এবং অদ্ভুত এক রকম শিস দিতে শুরু করল তাকে চালিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু হাতের ইশারায় তার শিস বন্ধ করে দিয়ে হঠাৎ ফগ সেনাপতিকে বলল—"যদি অভাগিনীকে উদ্ধার করা যেত!"

"উদ্ধার?"—সেনাপতি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

"আমার হাতে অতিরিক্ত বারো ঘণ্টা সময় আছে। আমি ওটা ওর জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি।"

সার ফ্রান্সিস অবাক হয়ে বললেন—"আপনার তাহলে হৃদয়ও আছে?"

"কখনও কখনও থাকে। যখন সময় থাকে হাতে।"—উত্তর দিল ফিলিয়াস ফগ।

* * *

দুঃসাহসের কাজ। দুরূহ তো বটেই, হয়ত বা অসম্ভবও। ফগ তো নিজের জীবন বিপন্ন করতে যাচ্ছেই, সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত পরিকল্পনাকেও। কিন্তু তবু তার মনে কোন দ্বিধা নেই।

সার ফ্রান্সিস সাগ্রহে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন।

পাসেপার্তুও। প্রভুর মতলব শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। প্রভুকে সে বুঝি সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে। এমন মহৎ হৃদয় রয়েছে ওই বরফের মত ঠাণ্ডা মোড়কের ভেতরে?

কিন্তু ওই পার্শী? ওই সহানুভূতি তো স্বভাবতঃই ওই হিন্দুদের দিকে থাকবার কথা। ও কি সাহায্য করবে? না যদি করে, ও নিরপেক্ষ থাকলেও সুবিধা অনেক। কিন্তু শত্রু হলে—

সার ফ্রানসিস স্পষ্টভাষায় তার মত জিজ্ঞাসা করলেন।

"সেনাপতি! আমিও পার্শী, ওই মহিলাও পার্শী। আমাকে আপনাদের দলে পাবেন।"

"ধন্যবাদ।"—উত্তর দিল ফগ।

"কিন্তু জানেন তো—ধরা যদি পড়ি, আমাদের জীবন তো যাবেই, সেটা বড় কথা নয়। অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে তবে ওরা মারবে আমাদের।"

"সেতখন দেখা যাবে"—বলে ফগ—"রাত পর্যন্ত দেরি করতেহবে নিশ্চয়ই?"

"তা ছাড়া উপায় কী?"

পার্শীর মুখ থেকেই তখন ওই অভাগিনী নারীর সম্বন্ধে সব-কিছু শোনা গেল। জাতিতে ও পার্শী। সারা ভারতে সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল ওর, এখনও আছে। বোম্বাইয়ের এক ধনী বণিকের মেয়ে। তবে পিতামাতা বর্তমান নেই। বোম্বাইয়েরই ইংরেজী বিদ্যালয়ে নিখুঁত সাহেবী ধরনের শিক্ষা দীক্ষা পেয়ে ও মানুষ। কেউ বলে না দিলে আলাপে-আচরণে কেউ ওকে ইওরোপীয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারবে না।

নাম ওর আউদা।

পিতামাতা নেই, বুন্দেলখণ্ডের ওই বুড়ো রাজা মাত্র তিন মাস আগে ওকে বিয়ে করে। আউদার ঘোরতর আপত্তি ছিল, কিন্তু আত্মীয়রা ওই রাজার টাকা খেয়ে ছলে বলে আউদার বিয়ে দিয়ে দেয়। এখন রাজাটা মরেছে, রাজার আত্মীয়রা রাজ-ঐশ্বর্যের ভাগ থেকে ওকে বঞ্চিত করবার জন্য জোর করে ওকে সহমরণে পাঠাচ্ছে। এ-অঞ্চলের প্রথাও বটে সহমরণ।

বলা বাহুল্য, এ-কাহিনী শুনে ফগ এবং তার সঙ্গীরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল ওকে উদ্ধার করবার জন্য। পার্শীকে বলা হল—"পিলাজি মন্দিরের যত কাছে সম্ভব, হাতি নিয়ে চল। তবে কেউ যেন দেখতে না পায়।"

আধ ঘণ্টা বাদেই থামতে হল, একটা ঝোপের ভেতর। পাঁচশো ফুট দূরেই মন্দির, অবশ্য তারা দেখতে পাচ্ছে না গাছপালার আড়াল থাকার দরুন। কিন্তু রাজার দলের ধর্মোন্মাদগুলোর চেঁচামেচি ঠিকই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে।

কী ভাবে বন্দিনীর কাছে পৌঁছানো যেতে পারে এই নিয়ে আলোচনা চলল। মন্দিরের ভেতরেই অবশ্য রেখেছে তাকে, পার্শী সে মন্দির দেখেছেও। লোকগুলো দরজায় দরজায় পাহারা দিচ্ছে নিশ্চয়ই। তবে তারা ঘুমিয়ে পড়বে এক সময়। তখন তাদের ডিঙ্গিয়ে দরজা দিয়েই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা উচিত? না, মন্দিরের পেছন দিক থেকে দেয়ালে সিঁধ কাটা উচিত?

সন্ধ্যা একটু ঘনিয়ে আসুক, কাছাকাছি গিয়ে অকুস্থান ভাল করে দেখে তবে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যে-ভাবেই হ'ক, এই রাত্রির ভেতরেই উদ্ধার করতে হবে মেয়েটিকে। কাল সকালে আর কোন উপায় থাকবে না। প্রত্যূষেই তো চিতায় আগুন দেবে ওরা।

ছয়টা বাজল। সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়েই নেমেছে। সন্ন্যাসীরা আর চিৎকার করছে না, কারণ ভাঙ্গ খেয়ে তারা সবাই হয়ে পড়েছে বেহুঁশ।

পার্শীই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বাকী তিনজন তার পেছনে চলেছে বন ভেঙ্গে, নিঃশব্দে। ঘন ডালপালার নীচে দিয়ে দশ মিনিট চলবার পরে, তারা ছোট্ট একটা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হল। তারই ওপারে দেখা যায় বড় একটা কাঠের স্তূপ।



সার ফ্রান্সিস পাশীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"সতী, না?"

নদী পার হয়ে ভাল করে দেখতেই বোঝা গেল এইটাই রাজার চিতাশয্যা। গাদা-করা চন্দন কাঠের ওপর রাজবেশ-পরিহিত মৃতদেহ শোয়ানোই রয়েছে। মশাল জ্বলছে, প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল নিয়ে। সুগন্ধে ভরপুর স্থানটা। চিতার কাঠে গন্ধ-তেল ঢালা হয়েছে ইতিমধ্যেই। কাল আগুন দেবার সময় আরও ঢালা হবে।

কাঠের গাদার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ফিলিয়াস ফগ আর তার সঙ্গীরা। মন্দিরের দ্বার একশো ফুটের মধ্যেই। কিন্তু তাতে লাভ কী? প্রহরী! প্রহরী! সজাগ প্রহরী চারিদিকে! এদের পাশ কাটিয়ে মন্দিরে ঢোকা একেবারেই অসম্ভব।

ফিলিয়াস বলে—"দুপুর রাত পর্যন্ত দেখা যাক। ততক্ষণে এরা ঘুমিয়ে পড়বে হয়ত।"

নদী পার হয়ে আবার তারা জঙ্গলের দিকে ফিরল। বেশী দূরে গেল না। একটা ছোট ঝোপের ভেতর বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মন্দিরের দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পেরিয়ে গেল। প্রহরীরা তবু তেমনি সজাগ।

ফিলিয়াস বলে উঠল—"এরা ঘুমিয়ে পড়বে—এ-ভরসায় থাকা চলে না আর। রীতিমত হুঁশিয়ার আছে সবাই। চল আমরা মন্দিরের পেছন দিক দিয়েই ঢোকবার চেষ্টা করি।"

অনেকখানি ঘুরতে হল আঁধারে আঁধারে। অবশেষে পৌঁছালো পেছন দিকে। এদিকে কোন পাহারা নেই। কিন্তু দেওয়াল নিরেট। একটি দরজা বা একটি জানালা কোথাও নেই। দেওয়ালে সিঁধ খোঁড়া ছাড়া উপায় কী এখন?

কিন্তু সে-জন্য হাতিয়ার তো দরকার! কিছু নেই ওদের সঙ্গে ছুরি ছাড়া। তাই দিয়েই চেষ্টা করতে লাগল পাসেপার্তু আর পার্শী। একটু আশার কথা, দেওয়ালের গাঁথনি পাকা নয়, ইট খুলতে বেগ পেতে হবে না। একখানা ইট বার করে আনতে পারলেই কাজ সোজা হয়ে আসে!

এল বেরিয়ে একখানা ইট অবশেষে। আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে ওরা। এমন সময়, কী দুর্দৈব, একদল প্রহরী আসছে—দেখা গেল। ওদের হুঁশিয়ারির অন্ত নেই। হঠাৎ ওদের মাথায় এসেছে যে, শুধুমাত্র দরজাটি সুরক্ষিত থাকলেই যথেষ্ট হল না, অন্যদিকেও চোখ রাখা চাই।

ওরা তাড়াতাড়ি দেওয়ালের পাশ থেকে সরে গেল—অদূরের একটা ঝোপের ভেতর গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। প্রহরীরা চলে গেলে আবার কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতলব।

কিন্তু ওদের তো চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। ওরা শিথিলপদে পায়চারি করছে। যেন এখানেই রাত কাটাবার মতলব। কোন সন্দেহ হয়েছে না কি ওদের মনে?

এখানেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা। স্যার ফ্রান্‌সিস অবশেষে বলে উঠলেন—"সাফল্যের কোন আশা দেখি না।"

"শেষ পর্যন্ত দেখি"—সংক্ষেপে উত্তর দেয় ফিলিয়াস।

"শেষ পর্যন্ত? কোন্ পর্যন্ত?"

"কাল সকাল পর্যন্ত, অর্থাৎ অভাগিনী নারীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।" ফিলিয়াসের কথায় দুর্জয় সংকল্পের আভাস।

এ-কথার কোন প্রতিবাদ কেউ করল না, কিন্তু পার্শী বোঝাল ওদের যে শেষ পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতেই হয়, তবে এখানে বসে থেকে লাভ নেই। কারণ চিতা রচনা করা হয়েছে মন্দিরের সমুখ দিকে।

এ কথা সত্য। পার্শীর পিছু পিছু সবাই মন্দির বেষ্টন করে আবার নদীতীরে এসে পূর্বস্থানে উপবেশন করল। সদর দ্বারে তখনও অতন্দ্র পাহারা।

রাত আর বেশী নেই। সকাল হলে এই চারজন মাত্র লোক ঐ ধর্মোন্মাদ জনতার কবল থেকে তাদের শিকার কেড়ে আনতে পারবে—এ আশা করাই বাতুলতা। সার ফ্রান্‌সিস এই মর্মে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। ফিলিয়াস বাধা দিয়ে বলল—"কাল দুপুর পর্যন্ত যদি এলাহাবাদ পৌঁছুতে পারি, তাহলেই চলবে আমার। ততক্ষণ দেখি—"

কী দেখবে ফিলিয়াস ফগ? স্যার ফ্রান্‌সিস বুঝতে পারেন না।

একটু সরে বসে ফিলিয়াস পাসেপার্তুর কানে কানে কি যেন বলতে থাকল কিছুক্ষণ ধরে। পাসেপার্তু দুই একবার "কী, কী" উচ্চারণ করল অবাক বিস্ময়ে, তারপর বলে উঠল—"কেনই বা হবে না?"

তারপরই নিঃশব্দে উঠে সে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল। সার ফ্রান্‌সিসের যতই কৌতূহল হক, ব্যাপারটা জানবার জন্য পার্শী বেচারী যতই উৎকণ্ঠাবোধ করুক, কেউ ফগকে প্রশ্ন করল না কিছু।

রাত ভোর হয়ে এল ; মশাল জ্বলছে বটে, কিন্তু আলোর চেয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বেশী। নিবিড় আঁধার ফিকে হয়ে এসেছে, মানুষের মুখ দেখা যায় না, কিন্তু মূর্তিটা চোখে পড়ে।

এই সময়ে মন্দিরের ভেতর আবার ঢোল করতাল বেজে উঠল। শতকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ শুরু করল ব্রাহ্মণেরা, নাচতে নাচতে ডিগবাজি খেতে খেতে সন্ন্যাসীর দল বেরিয়ে এল চিতার চার পাশে সারি বেঁধে দাঁড়াবার জন্য।

অভাগিনী বন্দিনীকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে বাইরে।

আফিং গাঁজার ধোঁয়া খেয়ে কাল ওর যে-নেশা জমেছিল, রাতের ভেতর তা কেটে গিয়েছে মনে হল। ও যেন প্রাণপণে যুঝবার চেষ্টা করছে ওদের সঙ্গে, আসতে চাইছে না চিতার দিকে, ছুটে পালাতে চাইছে প্রাণ নিয়ে। কিন্তু তা কি আর সম্ভব ?

জোর করে ধরে রেখে আবার ওর নাকের কাছে আফিংয়ের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল বর্বরেরা। আবার নেতিয়ে পড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল অভাগিনী। তারা ওকে টেনে এনে চিতার ঠিক নীচে শুইয়ে রাখল। যথাসময়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।

ঘন ঘন মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হল।

কাতারে কাতারে মানুষ এসে চিতা বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে। ফিলিয়াস উঠে নদী পার হল। নিঃশব্দে উঠলেন সার ফ্রান্সিস, তিনিও নদী পার হলেন। নিঃশব্দে উঠল পার্শী, সেও নদী পার হল। ভিড়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল তিনজনে। সভয়ে ফ্রান্সিস দেখ্লেন—ফিলিয়াসের হাতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কটিবন্ধে পিস্তল। দেখলেন বটে, বললেন না কিছু।

ফিলিয়াস তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু করছে না, সেই অভিমানে তিনিও কোন প্রশ্ন করছেন না তাকে। এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, নীরবেই সাহায্য করে যাচ্ছেন।

আর পার্শী ? সাহেবদের ওপর তার অটুট আস্থা। সে তাঁদের অনুসরণ করে যাচ্ছে।

তখনও আঁধার একেবারে যায়নি।

নীচে থেকে শুকনো কাঠের গাদা ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করেছে। এক্ষুনি লেলিহান অগ্নিশিখায় আলোকিত হয়ে উঠবে নদীপ্রান্তর মন্দির

প্রাচীর। ঢোল করতালের বাজনা, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রধ্বনি, সন্ন্যাসীদের উদ্দাম লম্ফ—এরই ভেতর রাজার আত্মীয়েরা অচৈতন্য আউদাকে তুলে ধরল চিতায় স্থাপন করবার জন্য।

কিন্তু এ কী?

হঠাৎ বাজনা থেমে গেল, অর্ধোচ্চারিত মন্ত্র গলায় আটকে গেল ব্রাহ্মণদের। সন্ন্যাসীরা নাচ বন্ধ করে আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরই—একী বিস্ময়!—সবাই—সেই কয়েক শত লোকের প্রত্যেকে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে দেবতার নাম জপতে জপতে ভয়ে কাঁপতে লাগল। অতবড় প্রান্তরে তিনটি মাত্র মানুষ খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তারা ফিলিয়াস ফগ, ফ্রান্সিস ক্রোমাটি আর পার্শী মাহুত।

ব্যাপার এই। চিতার উপর মৃত রাজা উঠে দাঁড়িয়েছে। রাজা যে—তাতে ভুল করবার উপায় নেই, কারণ—তার পরিধানে রাজবেশ মাথায় রাজপাগড়ি। মুখ? মুখ দেখবার কথা কারও মনে হয়নি। মুখ দেখবার উপায় ছিল না, কারণ অন্ধকার তখনও একটু একটু রয়েছে এবং চিতার আগুন তখনও প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে নি।

সুতরাং সবাই নিশ্চিত হল যে রাজা সত্যি সত্যি মরেননি, বা মৃত রাজা মা-কালীর কৃপায় পুনর্জীবিত হয়েছেন বা কোন প্রেতাত্মা মৃতরাজার দেহকে আশ্রয় করে কোন একটা পৈশাচিক কাণ্ড ঘটাতে উদ্যত হয়েছে।

সুতরাং ভয় পেয়ে সবাই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল। প্রাণভয়ে ডাকতে লাগল যার যার আরাধ্য দেবতাকে।

রাজা ততক্ষণে চিতা থেকে নেমে পড়েছেন। ভূলুন্ঠিতা আউদাকে একমুষ্টি পালকের মতই অনায়াসে কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে উপুড় হয়ে শোয়া মানুষগুলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে ফিলিয়াস ফগদের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

তারপর রাজার মুখ থেকে বাণী বেরুলো—"চলুন এইবার।"

রাজবেশী পাসেপার্তু আগে আগে ছুটল আউদাকে কাঁধে নিয়ে। পিছনে ছুটল ফগ, ফ্রান্সিস আর পার্শী। নদী পেরিয়ে জঙ্গল ভেঙে, তারা গভীর বনের ভিতর হাতিতে উঠল যখন, তখন শোনা গেল বনের সীমায় অনেক মানুষের কোলাহল, এবং এলোপাতাড়ি বন্দুকের শব্দ।

হাঁ, তারা অবশেষে আবিষ্কার করেছে যে মৃত রাজা চিতার উপরেই

শুয়ে আছেন। তবে তাঁর পরিধানে রাজপোশাক আর নেই। মাথায় নেই আর হীরে বসানো রাজপাগড়ি।

(৫)

এক ঘণ্টা পরে জঙ্গল থেকে বেরুলো ফিলিয়াসের হাতি। আউদার তখনও জ্ঞান হয়নি। ব্রাণ্ডি-মেশানো জল কয়েক ঢোঁক তার গলায় দিতে তবে একটু একটু করে চৈতন্যের আভাস দেখা দিতে লাগল।

সার ফ্রান্‌সিস অভিজ্ঞ লোক। মেয়েটির জ্ঞান হবে এখন—গাঁজা আফিংয়ের ধোঁয়ার নেশা এমন কিছু মারাত্মক নয়। সেজন্য তিনি ভাবছেন না। তিনি ভাবছেন—ওর ভবিষ্যতের কথা। এই হিন্দুদের তিনি জানেন। তারা অসম্ভব গোঁড়া, ধর্মের ব্যাপারে কোন বিঘ্ন তারা বরদাস্ত করে না। তাদের দিকে কোন অন্যায় ছিল, এ তারা স্বীকার করবে না। সম্পূর্ণ অপরাধ চাপাবে উদ্ধারকারীদের ওপরে এবং আউদাকে আবার হস্তগত করবার জন্য তারা করবে আকাশ-পৃথিবী আলোড়ন। এবং আর একবার তারা তাকে হাতে পেলে অভাগিনীর উদ্ধারের আর যে কোন সম্ভাবনাই থাকবে না, তা তো সকলেই বোঝে!

সার ফ্রানসিস তাঁর দুশ্চিন্তার কথা চুপি চুপি সবই বললেন ফিলিয়াসকে এবং কথার শেষ করলেন এই বলে যে—ভারতে থাকলে আউদা আবার তার পিশাচ আত্মীয়দের কবলে পড়বেই, এবং পড়লে তার মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং তাকে যদি সত্যিই বাঁচাতে হয়, ভারতের বাইরে বহু-বহু দূরে তাকে নিয়ে যাওয়া দরকার।

ফিলিয়াস শুধু বলল—"আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

বেলা দশটায় হাতি এলাহাবাদ পৌঁছুলো। এখান থেকেই আবার ট্রেন পাওয়া যাবে। সে ট্রেন একদিন এক রাত্রিতেই কলকাতা পৌঁছোবে। সুতরাং ফিলিয়াসের হাতে পর্যাপ্ত সময়। পরদিন দুপুরে ছাড়বে হংকং-এর স্টীমার কলকাতা থেকে।

রেল স্টেশনের একটা বিশ্রামকক্ষে আউদাকে বসিয়ে এতক্ষণে তার দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারল এরা। শুশ্রূষার ফলে তার চেতনা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল। ফিলিয়াস রাশীকৃত অর্থ দিয়ে

পাসেপার্তু'কে পাঠিয়ে দিল বাজারে। আউদার জন্য উপযুক্ত সাজসজ্জা কিনতে হবে। যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়।

পার্শীকে ডেকে তার পাওনাগণ্ডা সব মিটিয়ে দিল ফিলিয়াস॥ কিন্তু মজুরি মেটাতেই তো কৃতজ্ঞতার দাবি মেটে না! পার্শীটির কাছে এঁদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তার সাহায্য না পেলে আউদার উদ্ধার কোনমতেই সম্ভব হত না।

ফিলিয়াস ফগ তাকে হাতিটিই উপহার দিল কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে। সে বেচারী তো স্তম্ভিত—"মালিক! এ যে আশাতীত পুরস্কার!"

"নিয়ে যাও! তবু আমি তোমার কাছে ঋণী রইলাম।"

পাসেপার্তু' জিনিসপত্র কিনে সেইমাত্র ফিরে এসেছে। মনিবের উদারতার তারিফ করল সে। তারপর কয়েক খণ্ড মিছরি নিয়ে কিউনির মুখের কাছে ধরল। কিউনি গাঁক গাঁক করে আনন্দ প্রকাশ করল এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে উঁচু করে তুলল পাসেপার্তু'কে। কী সাহস ফরাসীটার! এ-মারাত্মক আদরে একটুও সে ভয় পেল না, পালটা আদরের চাপড় মারতে লাগল কিউনির মাথায়।

পার্শী বিদায় হল কিউনিকে নিয়ে, এরাও আউদাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। কামরার সবচেয়ে আরামের আসনটিতে আউদাকে বসিয়ে ওরা তার সামনে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল বাঁশি-বাজিয়ে।

আউদা এখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। এ অপ্রত্যাশিত পরিবেশে সে রীতিমত চমকিত। কোথায় পিলাজি মন্দিরে চিতায় পুড়ে মরতে যাচ্ছিল নৃশংস আত্মীয়দের চক্রান্তে, আর কোথায় এই ধাবমান রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরায় তিন তিনজন সাহেবের আশ্রয়ে সে সুখাসনে আসীন! মাঝখানের ঘটনাগুলো সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাকে সে-কাহিনী শোনাতে শুরু করলেন সার ফ্রান্সিস। ফিলিয়াস ফগের মহানুভবতা এবং পাসেপার্তু'র দুঃসাহসেই যে আউদার জীবনরক্ষা হয়েছে, ভালভাবেই তা বুঝিয়ে দিলেন। আউদার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভাষায় যত-না প্রকাশ পেল, পেল তা অশ্রুধারার অবিরল প্রবাহে।

সার ফ্রান্সিসের কথা শেষ হলে ফিলিয়াস প্রথম কথা বলল—"উনি

আমাকে বলেছেন—ভারতে থাকলে আপনার জীবন নিরাপদ থাকবে না। আপনার ভারতের বাইরে যাওয়া দরকার।"

পার্শী সত্য কথাই বলেছিল—আউদা নিখুঁতভাবে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হয়েছে। অপরিচিত সাহেবদের সামনে তার আচরণ এত স্বাভাবিক ও শালীনতাসম্পন্ন যে সার ফ্রান্‌সিস এবং ফিলিয়াস ফগ দুজনেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন!

অতি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে আউদা বলল—"সে কথা আমিও বুঝি। ভারতে থাকলে ওরা আমায় পুড়িয়ে মারবেই শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমি যাবই বা কোথায়?"

ফিলিয়াস যথারীতি সংক্ষেপে বলল—"আমি হংকং যাচ্ছি। সেখানে যাবেন?"

আউদা উৎসাহিত হয়ে উঠল—"হংকং যেতে পারলে খুবই ভাল হয়। সেখানে আমার এক কাকা থাকেন—খুব ধনী বণিক। তাঁর সঙ্গে অনেকদিন আমার কোন যোগাযোগ নেই বটে, কিন্তু আমি যে আশ্রয় পাব তাঁর কাছে—তাতে কোন সন্দেহই নেই আমার।"

তখন, আউদার হংকং যাওয়া সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিয় হয়ে, সবাই ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় মনোনিবেশ করল।

এলাহাবাদ থেকে বেনারস আশি মাইলের মত। দুই ঘণ্টার বেশী লাগবে না। এইখানেই নামতে হবে সার ফ্রান্‌সিসের। বেনারসের কয়েক মাইল দূরেই তাঁর পলটনের ছাউনি।

বেলা সাড়ে বারোটায় গাড়ি পৌঁছোলো সেখানে, আর ফ্রান্‌সিস বিদায় নিলেন। আউদা বিদায় দিল কৃতজ্ঞতার অশ্রুবর্ষণ করে; ফিলিয়াস ভাবাবেগের ধার ধারে না, হাতে হাত ছুঁইয়েই সে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। আর পাসেপোর্তু? সার ফ্রান্‌সিস নিজে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে জোরে জোরে নাড়া দিলেন। সে এতটা প্রত্যাশা করেনি—একেবারে অভিভূত হয়ে বলে উঠল—"কোনদিন যদি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি, তবে খবর দিলেই দেখবেন আমি আপনার কাছে হাজির হয়েছি।"

তারপর বিদায়।

বেনারসের পর গাঙ্গেয় উপত্যকা। শোভায় বিচিত্র, ঐতিহ্যে মহিমান্বিত। প্রথমে বেহার। পাহাড়ের পরে প্রান্তর, প্রান্তরের পরে

আবার পাহাড়। মাঝে মাঝে অরণ্য, তার কোলে কোলে গ্রাম, কী পারিপাট্য সে সব গ্রামের, দুই একটা হাতি কলাবাগান ভাঙ্গছে। জেবু চরছে দলে দলে। আর গঙ্গার বাঁকে বাঁকে ঘাটে ঘাটে যত্রতত্র স্নানার্থীরা ভিড় করেছে কাতারে কাতারে।

চুনারের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ। গঙ্গাতীরে লর্ড কর্নওয়ালিশের সমাধি, বক্সারের কেল্লাবেষ্টিত শহর, পাটনার আফিংয়ের বাজার, যা শিল্পনগরী হিসাবে ম্যাঞ্চেস্টার বা বার্মিংহামের মতই উল্লেখযোগ্য—মুঙ্গের, একে একে চোখের ওপর ভেসে ওঠে এক পলকের জন্য।

তারপর এল রাত্রি। এঞ্জিনের শব্দে ভয় পেয়ে, বাঘ আর নেকড়ের পাল ছুটে ছুটে পালায়, গাড়ি পূর্ণ গতিতে অতিক্রম করে যায় গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ, মুর্শিদাবাদের পরিত্যক্ত রাজধানী, বর্ধমান, হুগলী এবং অবশেষে চন্দননগর—দিনের বেলা হলে যেখানে ফরাসীপতাকা উড্ডীন দেখে পাসেপার্তু নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট হত।

সকাল সাতটায় কলকাতায় পৌঁছে গেল গাড়ি। দুপুরের আগে হংকং-এর স্টীমার ছাড়বে না। ফিলিয়াস ফগের হাতে প্রচুর সময়—পুরো পাঁচ ঘণ্টা।

হিসাবমত ২৫শে অক্টোবরই তার কলকাতায় পৌঁছোবার কথা। সেইদিনই সে পৌঁছেছে। সময় বাঁচাতেও পারেনি, পিছিয়েও পড়েনি। হ্যাঁ, ভূমধ্যসাগর থেকে আরব সাগর-এর মধ্যে দুটো দিন সে এক সময় বাঁচিয়েছিল বইকি! কিন্তু আউদাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সেই দুটো দিন ব্যয় হয়ে গিয়েছে আবার।

হয়ে থাকে ব্যয়, হক। তার জন্য এতটুকু আপসোস নেই ফিলিয়াস ফগের।

ফিলিয়াসের ইচ্ছে সোজা স্টীমারে গিয়ে ওঠা, যাতে আউদা সেখানে গিয়ে আরাম করতে পারে। এক মুহূর্তও তো আউদাকে একা রেখে যাওয়া চলবে না যতক্ষণ ভারতবর্ষ থেকে বেরুতে না পারা যাচ্ছে! কারণ এদেশ তার পক্ষে বিপজ্জনক।

তাই আউদাকে নিয়ে ডকের পথই সে ধরতে যাচ্ছে এমন সময় একটা পুলিস এগিয়ে এল।

"আপনি কি মিস্টার ফিলিয়াস ফগ?"

"হ্যাঁ।"

"আর সঙ্গের এই লোকটি—এটি আপনার ভৃত্য নিশ্চয় ?"

"নিশ্চয়।"

"আপনারা দুজনই দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।"

ব্যাপারটা যতই আশ্চর্য হোক, প্রতিবাদ বা উপেক্ষা করবার কথাও ভাবতে পারে না ফিলিয়াস ফগ। ইংরাজের চোখে আইনের মর্যাদা সকলের ওপরে। এবং এই পুলিস-কর্মচারী আইনেরই বাহুবিশেষ।

একখানি পাল্‌কিগাড়ি ডেকে পুলিস এদের উঠতে বলল। ফিলিয়াস শুধু জিজ্ঞাসা করল—"এই মহিলা আসতে পারেন তো আমাদের সঙ্গে ?"

"বাধা নেই"—বলল পুলিস।

তিনজনে গাড়িতে চড়ে চলল। কালা শহর পেরিয়ে চলল তারা—দুই একখানা পাকাবাড়ির পরেই বড় বড় কুঁড়েঘরের বস্তি, নোংরা পুকুর, ঘেয়ো কুকুর, পথে আবর্জনার পাহাড়। ক্রমে এসে পড়ল সাদা শহরে—সাহেবদের বড় বড় বাড়ি, বড় বড় হাতার ভেতরে ফুলবাগান আর বড় বড় গাছের সমারোহ, মসৃণ পরিচ্ছন্ন রাজপথ, এই সকালবেলাতেই সেজেগুজে সাহেব মেমেরা বেড়াতে বেরিয়েছে।

সাদা শহর ছাড়িয়ে একখানা অতি সাধারণ বাড়ি। এইটিই আদালত। পুলিশ লোকটি ফিলিয়াসদের এইখানেই এনে তুলল। আদালত-কক্ষে তাদের বসিয়ে তারপর বলল—"জজ ওবাদিয়া আসবেন সাড়ে আটটায়, তাঁর সামনে হাজির হবেন আপনারা।"

এই বলে সে বেরিয়ে গেল, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে।

পাসেপার্তু আর্তনাদ করে উঠল—"আমরা কয়েদী তাহলে !"

আর্তনাদ নয়, তবু খুবই কাতর হয়ে বিলাপ করে উঠল আউদা—"এসব আমারই জন্য। আমাকে উদ্ধার করার জন্যই আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে। আমাকে ত্যাগ না করলে রক্ষা নেই আপনাদের।"

ফিলিয়াস একথা বিশ্বাস করে না। আউদার ব্যাপারে অভিযোগ ? কী সাহসে অভিযোগ করবে সেই নৃশংস দানবেরা ? তাদের নিজেদের আচরণ যে ব্রিটিশ আইনের চোখে ভয়ানক রকম দণ্ডনীয় !

তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি তারা এসে নালিশ করবেই বা কেমন করে ?

নাঃ ও-ধারণা একান্তই ভুল। সে সেই কথা বলে আউদাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু আশ্বস্ত কি আর হতে পারে আউদা ?

সে কেবলই বলতে থাকল—"আমার ব্যাপার ছাড়া আর কি কারণে আপনাকে আটক করতে পারে ?"

পাসেপার্তু মন্তব্য করে—"কারণ যাই হক, হংকং-এর স্টীমার ত আর ধরা হল না !" তার স্বরে গভীর নৈরাশ্য।

স্টীমার তো ছাড়ে বারোটায় !"—নিশ্চিন্ত জবাব ফিলিয়াসের।

"তার মধ্যে আমরা ছাড়া পাব ?"

"নিশ্চয়।"

বলা বাহুল্য পাসেপার্তু বিশ্বাস করতে পারল না প্রভুর কথা।

অতঃপর নীরব প্রতীক্ষা সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

সাড়ে আটটাতেই জজ এলেন অবশ্য। আগে আগে জজ, পিছনে তাঁর কেরানী। দেয়ালের হুকে হুটো পরচুলা। পরচুল মাথায় পরে বিচারে বসা জজসাহেবদের রীতি।

ওবাদিয়ার প্রথম কাজই হল হাত বাড়িয়ে পরচুলা টেনে নেওয়া। সেটা মাথায় চড়িয়েই চেয়ারে বসে পড়লেন—"প্রথম মামলা ডাকো।"

তারপরই উসখুস করে উঠলেন—"চুলটা তো আমার বলে ঠেকছে না।"

কেরানী অয়েস্টারপাফ বলে উঠল—"কি করে ঠেকবে ? ওটা তো আমার চুল !"

ওবাদিয়া নিজের মাথা থেকে চুল খুলে কেরানীর দিকে ছুড়ে দিলেন—"কেরানীর পরচুল মাথায় পরে কোন্ জজ বিচার করতে পারে। করুক তো ! ডাকো—প্রথম মামলা।"

এক হাতে জজের দিকে চুল এগিয়ে দিতে দিতে ওয়েস্টারপাফ অন্য হাতে কাগজ ওল্টাচ্ছে—"প্রথম মামলা—আসামী ফিলিয়াস ফগ জাঁ পাসেপার্তু—"

ওদিককার বেঞ্চ থেকে তিনজন হিন্দু পুরোহিত এগিয়ে এল। ফিলিয়াস নিজের মনে ভাবল—"আউদার কথাই ঠিক হল দেখছি। পিলাজি মন্দিরের পুরোহিতগুলোই এনেছে নালিশ। অবাক কাণ্ড! ওরা এল কি করে ?"

আদালতের কেরানীর আহ্বানে একজন পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে তার

অভিযোগ বিবৃত করল। আসামী (পাসেপার্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল) তাদের পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করে তার পবিত্রতা নষ্ট করেছে, হিন্দুধর্মের অপমান করেছ, ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেছে—মহারানীর ভদ্র প্রজাদের। এর প্রতিকার প্রার্থনাতেই তারা তিনজন—হিন্দু জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপেই এই আদালতে অভিযোগ এনেছে।

ওবাদিয়া গম্ভীর হয়ে বললেন—"গুরুতর অভিযোগ। এ বিষয়ে আসামীদের কি বলবার আছে?"

ফিলিয়াস ফগও ধারণা করে বসে আছে যে এ-অভিযোগে একেবারে বিনা সাজায় অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হবে না। সে সাজাটা কি হতে পারে, এবং কত তাড়াতাড়ি আদালতের আদেশ পালন করে এখান থেকে বেরুতে পারা যেতে পারে, সেইটিই তার একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। ঘড়ির দিকে চোখ রেখে সে উঠে দাঁড়াল এবং বলল—"বলবার আর কিছু নেই। মানবতার খাতিরে যদি আমরা এদের ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত করতে বাধ্য হয়ে থাকি, আদালত নিশ্চয়ই সেটা একটা গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচনা করবেন না। এরা যে পৈশাচিক এবং বে-আইনী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল সে সময়, তাই এরা স্বীকার করুক আদালতে। তা হলেই আমাদের অপরাধ যে কত তুচ্ছ—তা মহামান্য বিচারকের উপলব্ধি হবে!"

পুরোহিত তিনজনের মুখের চেহারা দেখবার মত। স্পষ্টই বোঝা যায় ফগের কথা তাদের বোধগম্য হয়নি! কী পৈশাচিক, কী বে-আইনী কাজে তারা লিপ্ত ছিল?

সেই মর্মেই তারা একটা অস্বীকৃতি পেশ করেছে কি না-করেছে, পাসেপার্তু লাফিয়ে উঠল এই বলে—"মিথ্যুক সব! তোমরা বলতে চাও যে পিলাজি মন্দিরে তোমরা এই মহিলাকে পুড়িয়ে মারতে চাও নি?"

"পি-লা-জি মন্দিরে?"—পুরোহিতেরা হাঁ করে ফেলে।

কেরানীও আপত্তি করে—"কোথাকার পিলাজি মন্দির? এই আবেদনে তো মালাবার পাহাড়ের মন্দিরের কথাই লেখা আছে।"

"মা-লা-বার পাহাড়?"—এবার হাঁ করবার পালা পাসেপার্তুর। ফিলিয়াস ফগও চমকে ওঠে। হ্যাঁ, সেখানে পাসেপার্তু একটা গোলমাল করেছিল বটে। কিন্তু তার কথা তো এরা ভুলেই বসে আছে। সেই অতি সামান্য ব্যাপারের জের কলকাতা পর্যন্ত গড়িয়েছে? গেরো!

এদের বিব্রত ভাব দেখতে পেয়ে পুরোহিতেরা চেপে ধরল আরও। "মালাবারের মন্দিরে ঢুকে মন্দিরের পবিত্রতা তুমি নষ্ট করেছ, তা অস্বীকার করতে পার? এই যে জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে—এ জুতো কার?"

হাতের মোড়ক খুলে এক জোড়া জুতো বার করল পুরোহিত।

'আমার! আমার জুতো!"—জুতোর পুনর্দর্শনে পুলকিত হয়ে পাসেপার্তু ভুলে গেল যে বিবাদী জুতোর মালিকানা স্বীকার করে নেওয়ার ফলে মামলায় হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হবে।

হলও তাই—জজ ওবাদিয়া টুঁটি টিপে ধরলেন পাসেপার্তুর। "তুমি তাহলে অপরাধ স্বীকার করছ?"

আর তো স্বীকার না করে উপায় নেই! ঢোঁক গিলে সে বলল—"তা আমি তো জানতাম না যে মন্দিরে ঢুকলে মন্দিরের জাত যায়! সে যাই হক—অপরাধ যদি হয়ে থাকে তো আমার হয়েছে, আমার মনিব তো আর ঢোকেন নি সে-মন্দিরে!"

ওবাদিয়া খসখস করে দণ্ডাজ্ঞা লিখে ফেললেন—"কারও ধর্মের অবমাননা করা অতি গুরুতর অপরাধ। আসামী পাসেপার্তু সে অপরাধ স্বীকার করেছে। তার দু' সপ্তাহ কারাবাস এবং তিন শো পাউণ্ড জরিমানার আদেশ হল। আর তার মনিব মিস্টার ফিলিয়াস ফগের অপরাধ ততটা প্রত্যক্ষ না হলেও, ভৃত্যের অনাচারে তার যে প্রশ্রয় ছিল না, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং তাকেও আটদিনের কারাবাস এবং দেড়শো পাউণ্ড জরিমানার আদেশ দিলাম। দুই নম্বর মামলা—"

ফিলিয়াস ফগ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"আমি এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করব। সেজন্য জামিন চাই।"

ওবাদিয়া বললেন—"সে অধিকার আপনার আছে। তবে আপনি এখানে অপরিচিত ভ্রমণকারী, সুতরাং জামিনের পরিমাণ খুব বেশী হবে। আপনার এবং আপনার ভৃত্যের প্রত্যেকের জন্য হাজার পাউণ্ড জামিন চাই।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যাগ থেকে দুই হাজার পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট বার করে কেরানীর হাতে দিল ফিলিয়াস। জজ বললেন—"জেল খেটে বেরুলে তখন এই দুই-হাজার পাউণ্ড ফেরত পাবেন।"

সে-কথা বোধহয় কানেও ঢুকল না ফিলিয়াসের। আউদার হাত ধরে, পাসেপার্তুকে সঙ্গে নিয়ে সে গটমট করে বেরিয়ে পড়ল আদালত থেকে এবং সোজা রাস্তায় গিয়ে একখানা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসল—"ডক" —হুকুম দিল কোচম্যানকে।

পেছন ফিরে যদি তাকাত ফিলিয়াস—সে অবাক হয়ে যেত। কারণ একটা লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে তার গাড়ির পেছনে। সে নিজে তাকে না চিনলেও পাসেপার্তু তাকে চিনত নিশ্চয়ই। কারণ সে লোক আর কেউ নয়—সেই ডিটেকটিভ ফিক্স।

বস্তুতঃ ফিক্সই হল এই নাটের গুরু।

বোম্বাই থেকে যখন ট্রেনে উঠল ফিলিয়াস ফগ, তখন ফিক্স সেই ট্রেনে উঠতে গিয়েও উঠল না।

পাসেপার্তু যখন মালাবার মন্দিরের শোচনীয় ঘটনা তার মনিবের কাছে বর্ণনা করছিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, আড়াল থেকে ফিক্স তা শুনেছিল। সে বিবেচনা করল যে, লণ্ডন থেকে ওয়ারেন্ট যতদিন না আসে, ততদিন ফিলিয়াস ফগকে ভারতবর্ষে আটকে রাখবার একটা সুযোগ তার হাতে এসেছে। মালাবার মন্দিরের ঘটনাকে হিন্দুধর্মের স্বেচ্ছাকৃত অবমাননা বলে অনায়াসেই খাড়া করা যাবে কোর্টে। আর তাহলেই ফগের কিছুদিন কারাবাস অনিবার্য।

তাই ফগের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে না উঠে সে স্টেশন থেকে চলে গেল মালাবার মন্দিরে। সেখানকার পুরোহিতদের মোটা ক্ষতিপূরণের প্রলোভন দেখাল। তারই বশীভূত হয়ে তিনজন পুরোহিত বোম্বাই কোর্টে অভিযোগ আনল ফিলিয়াস ফগ আর পাসেপার্তুর বিরুদ্ধে এবং আবেদন জানাল যে ওদের গ্রেফতার করবার জন্য কলকাতায় ওয়ারেন্ট পাঠানো হক এবং বিচারের ব্যবস্থা কলকাতাতেই করা হক।

সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ারেন্ট চলে গেল, এবং তারই সঙ্গে পুরোহিতদের নিয়ে ফিক্সও রওনা হয়ে গেল কলকাতায়। ২৫শে তারিখের আগে স্টীমার নেই কলকাতা থেকে। সুতরাং আসামীদের পাকড়াবার সময় ওখানে পাওয়া যাবে।

কলকাতায় এসেই খোঁজ খবর শুরু করল ফিক্স। না, ফগ তো আসেনি।

কি করে আসবে ? ফগ যে পিলাজি মন্দিরে আউদার উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে !

কিন্তু ফিক্স তো আর জানে না তা ! সে ভয়ানক দমে গেল। তার ধারণা হল যে ফগ মধ্যভারতের কোন দেশীয় রাজ্যের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে ওয়ারেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে। লুঠ-করা পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড যার পকেটে, সে জঙ্গলের ভেতরও আরামে দিন কাটাতে পারবে।

ট্রেনের পর ট্রেনে হাজিরা দিয়ে দিয়ে ফিক্স যখন একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম করেছে, ঠিক সেই সময় সে আবার উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওই যে ! গাড়ি থেকে নামছে ফিলিয়াস ফগ পাসেপার্তু এবং—

আরে যা ! এ মেয়েটাকে আবার কোথা থেকে জোটালো ?

কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার। সে ছুটে গিয়ে একজন পুলিস কর্মচারীকে ইঙ্গিত করল এবং সেই কর্মচারী এসে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল ফগদের।

তারপর হল বিচার, এবং তারও পরে অর্থের জোরে দণ্ডিত আসামীও মুক্তি পেয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল।

এই রকম একটা পরিণতি হিসাবের বাইরে ছিল ফিক্সের। সে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। ধরা পড়েও হাত ফসকে পালাল লোকটা।

কিন্তু যাবে ও কোথায় ? "রেঙ্গুন" জাহাজে উঠেছে। ও-জাহাজ তো হংকং পর্যন্ত। হংকংও ইংরেজ রাজ্য। সেখানেও ওকে ধরা যাবে। ফিক্স বোম্বাইয়ে নির্দেশ দিয়ে এসেছে—ওয়ারেণ্ট পৌঁছালে সেটা কলকাতায় পাঠাতে হবে। আবার কলকাতাতেও নির্দেশ দিয়ে যাবে—ওয়ারেণ্ট পৌঁছালে সেটা হংকং পাঠাতে হবে।

এখন বেলা এগারটাও বাজে নি। রেঙ্গুন ছাড়বে বারোটায়। সময় আছে। ডক থেকে পুলিস আফিসে ছুটল ফিক্স, এবং সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা করে আবার ছুটল ডকের দিকে।

হ্যাঁ, ধরবে ও ঠিক। ব্যাঙ্ক দস্যুটাকে না ধরে ও ছাড়বে না। কিন্তু ধরে ফিক্সের নিজের লাভ কতদূর কি হবে, সেইটিই এখন ভাবছে অভাগা। যে-পরিমাণ অর্থ দস্যুর কাছ থেকে উদ্ধার হবে, তারই ওপরে একটা শতকরা কমিশন ডিটেকটিভের পাওনা। কিন্তু এই অসভ্য দস্যুটা টাকা খরচা করছে জলের মত। এরই মধ্যে সে হাজার পাঁচেক পাউণ্ড ফুঁকে

দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এই দেখ না, এক কথায় দুই হাজার পাউণ্ড ওবাদিয়ার আদালতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেল! টাকার মায়ায় ও কি আর জেল খাটবার জন্য কলকাতায় ফিরে আসবে? বিশেষ করে ওর যখন ভাল রকম জানা আছে যে আটদিনের জন্য এখনকার জেলে ঢুকলে, সেখান থেকে আট বছরের জন্য লণ্ডন জেলে বদলি হয়ে যাওয়ার ঘোরতর আশঙ্কা আছে?

না, ও আর আসবে না। ছুটে ছুটে বেড়াবে, এবং ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেবে পকেটের পাউণ্ডগুলো। ফিক্সের কমিশন বিশেষ একটা মোটা অঙ্কে পৌঁছানোর কোন আশা নেই।

(৬)

গোড়ার দিকে রেঙ্গুন জাহাজ স্বচ্ছন্দেই চলল কয়েকদিন। আবহাওয়া অনুকূল, বঙ্গোপসাগরের মূর্তি প্রসন্ন। গ্রেট আন্দামান দ্বীপে এসে গেল ক্রমশঃ। জাহাজ এখানে ভিড়ল না, বেয়ে চলল এর উপকূল দিয়ে। বর্বর পাপুয়ানদের বাস এখানে। তারা কেউ কূলের কাছে এল না জাহাজ দেখে। অতি নিম্নস্তরের মানুষ এরা, কিন্তু নরখাদক নয়।

জাহাজ থেকেই চোখে পড়ে স্যাড্‌ল্ পীক্ পর্বত—চব্বিশ শো ফুট উঁচু। সেগুন কাঠের অরণ্য, বাঁশ এবং তালের বন সেই পর্বতের সানুদেশে। কূলের কাছ দিয়ে হাজারে হাজারে বাবুই পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে—এদের বাসা চীনাদের প্রিয় খাদ্য।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে মালাক্কা প্রণালীর দিকে ছুটল জাহাজ। মঙ্গোলিয়ার মতই দ্রুতগামী হলেও রেঙ্গুন জাহাজ তেমন আরামপ্রদ নয় মোটেই। আউদার জন্য তেমন ভাল জায়গা পাওয়া যায়নি এতে। কিন্তু তাতে আউদার কোন ক্ষোভ নেই। সে ফিলিয়াসের রীতি চরিত্র অনুধাবন করতেই ব্যস্ত।

ফিলিয়াস ফগ রোজই খানিকটা সময় আউদার সান্নিধ্যে কাটায়। নিজের সম্বন্ধে আউদার কি বলবার আছে, শোনে সেটা। বস্তুতঃ সাক্ষাৎকালে ফগ কথা বলে কমই, সে শুধু শান্তভাবে শুনে যায় আউদার

মিষ্টি কথার কাকলী। ইংরেজী ভাষা যেন অশেষ গুণে মধুর হয়ে উঠেছে ওর কণ্ঠে।

পার্শী মাহুত আউদার সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছিল, আউদার নিজের বিবরণ তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। তবে বেশির ভাগ পাওয়া গেল কয়েকটা নাম—যেমন প্রসিদ্ধ ধনী সার জেমস জিজিভাই তার কাকা, যে-সার জেমসকে ব্রিটিশ সরকার নানাভাবে সম্মানিত করেছেন। সেই সার জিজিভাইয়েরই এক মামাতোভাই হংকং-এ থাকেন, এঁরও নাম জিজি। এঁর কাছেতেই আউদা যাচ্ছে।

"কিন্তু তাঁর কাছে যে আপনি থাকতে পারবেন, সে-সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত তো?"—জিজ্ঞাসা করে ফগ।

"না, তা কেমন করে নিশ্চিত হব? তাঁর কোন খোঁজ-খবরই তো বহুদিন পাইনি আমি।"

"না-ও যদি তাঁর কাছে আশ্রয় পান, আপনার দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। সবই ঠিক হয়ে যাবে।" আশ্বাস দেয় ফগ।

আউদা এই লোকটিকে বুঝতে পারে না। একান্ত নিরাসক্ত কথাবার্তা এর। ভাবাবেগের লেশ নেই এর চরিত্রে। আউদার সঙ্গে আলাপে-আচরণে তার শিষ্টতা সৌজন্যের সীমা নেই, কিন্তু সব কিছুই যেন একান্ত যান্ত্রিক। হৃদয়ের সংস্পর্শ কোথাও উপলব্ধি করা যায় না। এ এক রহস্য।

পাসেপার্তুর কথায় রহস্যের মীমাংসা হয় কতকটা। সে বলে—তার মনিব খেয়ালী মানুষ আশ্চর্য রকম খেয়ালী। খেয়ালের নমুনা স্বরূপ সে পৃথিবী পরিক্রমার বাজির কথা উল্লেখ করেছে। শুনে হেসেছে আউদা। এ-বাজি কখনো জেতা যায়? অবশ্য ফিলিয়াস যাতে জেতে, সেই কামনাই আউদার, কারণ ফিলিয়াস তো তার উদ্ধারকর্তা, আশ্রয়দাতা!

ফিক্সও রয়েছে জাহাজে। কয়েকদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাটাল। লুকিয়ে কেবিনে বসে বসে পরিস্থিতিটা অধ্যয়ন করল ভাল করে। একটা সংকটের ক্ষণ এগিয়ে আসছে। লণ্ডন থেকে বেরিয়ে অবধি যত জায়গায় এযাবৎ সে ফগের অনুসরণ করেছে, প্রত্যেকটাই ইংরেজদের অধিকৃত। সিঙ্গাপুরে জাহাজ ভিড়বে, সেটাও ইংরেজদের। তারপর ভিড়বে হংকং-এ। চীন দেশের ভেতরে হলেও সেটাও ইংরেজ উপনিবেশ। এ সব জায়গায়

ফগকে গ্রেফতার করার কোন অসুবিধা ছিল না, হাতে ওয়ারেণ্ট থাকলে। কিন্তু হংকং-এর পর ?

হংকং-এর পর সমুদ্র পেরুলেই জাপান। সেখান থেকে মহাসমুদ্র পেরুলে আমেরিকা। এর কোন জায়গাতেই লণ্ডনের ওয়ারেণ্টের দাম নেই এতটুকু। ওই ওয়ারেণ্ট-বলে ফগকে গ্রেফতার করতে হলে তখন দরকার হবে স্বতন্ত্র একটা বহিষ্কারের আদেশ, যে আদেশ দেবার অধিকারী সেই দেশের সরকার। সুতরাং সে-রকম আদেশ বার করতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেকদিন ধরে। ততদিন সুবিশাল আমেরিকার কোন্ রন্ধ্রে আত্মগোপন করবে এই অতিধূর্ত দস্যু, তার কিছু ঠিকানা আছে ?

সুতরাং হংকং-এ ওকে ধরতেই হবে।

যদি দেখা যায় হংকং-এ ওয়ারেণ্ট পৌঁছায়নি, তাহলে এমন কিছু বন্দোবস্ত করতেই হবে, যাতে ফগ হংকং ত্যাগ করতে না পারে। তার দেরি করিয়ে দিতে হবে যেমন করেই হক।

প্রয়োজনক্ষেত্রে কী ভাবে সেটা করা যেতে পারবে—সেটা এখন থেকেই ভেবে রাখা ভাল।

নানারকম ফন্দী মাথায় আসে একে একে, একটা একটা করে বাতিল হয়ে যায়। সব শেষে একটা জিনিস মাথায় টিকে গেল। সেটা হল এই যে ফগের ভৃত্যটাকে বাজিয়ে দেখা উচিত। সে কি সত্যই ফগের দস্যুতার সহযোগী নয় ? সেই রকমই ধারণা হয়েছিল আগের কথাবার্তা থেকে। সে-ধারণা যদি অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ তাঁকে যদি সত্যিই সাধু বলে মেনে নেওয়ার মত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তাকে নিজের দলে টানার বাধা কি ? শত্রুর শিবিরে একজন গুপ্তচর রাখতে পারলে তাতে সুবিধা অনেক। ফগের গতিবিধির খবর আগে থাকতে পাওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে। চাই কি হয়ত সে-গতিবিধির পথে বাধা সৃষ্টিও করা যেতে পারে ওর মারফত।

তাহলে পাসেপার্তুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। কলকাতায় জাহাজে ওঠবার সময় সে সতর্ক হয়েছিল যাতে ওর চোখে পড়ে যেতে না হয়। বরাবর সেই সতর্কতাই বজায় রেখে এসেছে ফিক্স, অর্থাৎ পাসেপার্তুর চোখে পড়তে হয়, এমন জায়গাগুলো সে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ—

পাসেপার্তুকে ডেকের ওপর দেখতে পেয়ে সে দূর থেকে ছুটে গেল তার দিকে—"আরে, তুমি এখানে ?"

পাসেপার্তুও অবাক! "আপনি এখানে? হংকং-এর স্টীমারে? আপনাকে না বোম্বাই রেখে এলাম ?"

"আরে ভাই, পরের চাকরি। যেখানে বলবে সেখানে যেতে হবে তো! বোম্বাই থেকে হুকুম পেলাম—হংকং যেতে হবে। যাচ্ছি।"

"আবার হংকং পৌঁছোবার পর যদি ইয়োকোহামা যাওয়ার হুকুম হয়, যাবেন অবশ্য ?" পাসেপার্তুর চোখে হাসির ঝিলিক।

প্রশ্নটাতে হকচকিয়ে যায় ফিক্স। ফরাসীটা সন্দেহ করেছে নাকি? ঢোঁক গিলে বলে—"না, হ্যাঁ, মানে—কয়েকদিন অন্ততঃ হংকং থাকতেই হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

কথা পালটে দেবার জন্যই সে জিজ্ঞাসা করে—"তা তোমার মনিব আছেন ভাল ?"

"হ্যাঁ, তা আছেন।"

"এখনও পৃথিবী প্রদক্ষিণের কল্পনা মাথায় আছে নাকি ?"

"বাঃ, তা না হলে আর হংকং যাচ্ছি ?"

"তা, তাঁকে তো ডেক-এ দেখি না কখনও ?"

"তিনি কমই আসেন। কিন্তু আমি তো সর্বদাই আছি এই ডেকের ওপরে। আপনাকে তো কই দেখিনি এতদিন!"

ফিক্স আবার ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়—"একটু অসুস্থ ছিলাম হে! সামুদ্রিক পীড়া। আরব সমুদ্র আমাকে ঘায়েল করেনি। কিন্তু ভারত মহাসাগর রেহাই দিলে না। কেবিনেই শুয়ে বসে দিন কেটেছে আমার। তোমার প্রভুরও কি তাই ?"

"না, না। তিনি সুস্থ আছেন। তবে তিনিও নিজের ঘরে বসে থাকাই পছন্দ করেন, যদিও বর্তমানে তাঁকে মাঝে মাঝে কেবিন থেকে বেরুতে হচ্ছে মিসেস আউদার সঙ্গে কথাবার্তা কইবার জন্য। জানেন আমাদের সঙ্গে এবার একজন মহিলা আছেন ?"

মহিলা একজন দেখেছে বটে ফিক্স। কিন্তু কে সে—কিছুই বুঝতে পারেনি। বুঝবার সুযোগ এই। সে অবাক হওয়ার ভান করে বলল—"মহিলা ? কে তিনি ? কোথা থেকে এলেন ? কোথা যাবেন ?"

পাসেপার্তু তো গল্প করতে পেলে বাঁচে। আউদার ইতিহাস সে সবিস্তারে বর্ণনা করতে বসল।

সব শুনে ফিক্স একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। সে ভেবেছিল দস্যুটা বুঝি দস্যুবৃত্তির সঙ্গে নারীহরণেও হাত দিয়ে থাকে। তা যদি হয়, তবে ওকে কায়দা করবার আর একটা হাতল পাওয়া গেল। সেইদিক দিয়েই কিছু প্রমাণ পাসেপার্তুর মুখ থেকে সে বার করবার ফিকিরে ছিল। কিন্তু না, সে রকম কিছু আশা নেই আপাততঃ। ও-হাতল দেখা যাচ্ছে গোড়াতেই ভাঙ্গা।

তখনকার মত পাসেপার্তুর সঙ্গে আলোচনা এই পর্যন্তই হয়ে রইল।

কিন্তু অতঃপর ঘনঘনই দেখা হতে লাগল দুজনে। ফিক্স সর্ব-প্রযত্নে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে পাসেপার্তুর সঙ্গে। পাসেপার্তুও কম ধূর্ত নয়। ফিক্সের মদ সে অহরহই গিলছে, আমন্ত্রণ পেলেই। খোশগল্পতেও সে বিতৃষ্ণা দেখায় না। কিন্তু মনে মনে একটা সন্দেহ হয়েছে তার। এই ফিক্স কে? কি কাজ এর? যেখানে ফগ, সেখানেই ফিক্স! সুয়েজে দেখা হয়েছে, বোম্বাইয়ে কলকাতায় দেখা না হলেও সে যে আশেপাশেই ছিল, এমন বিশ্বাস করবার কারণ আছে। তারপর এই যে হংকং চলেছে। এর পরেও হয়ত—

"আপনি কি সত্যি সত্যি হংকং-এর পরে আর আমাদের সঙ্গে যাবেন না?"—কুটিল হাসি হেসে সে একদিন জিজ্ঞাসা করল ফিক্সকে। সে বেচারা এমন সোজা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

গাম্ভীর্য বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বলল—"তোমাকে তো বলেছি আমাকে মনিবের হুকুম মেনে চলতে হয়। যদি যাওয়ার হুকুম পাই, যেতে হবে বইকি!"

ফিক্সের এই মনিবটা কে হতে পারে? পাসেপার্তু খুব মাথা ঘামাতে থাকে। অবশেষে তার মাথায় এলও সে-প্রশ্নের একটা জবাব। সেটা কি? না, ফিক্সের মনিব হচ্ছে লণ্ডনের রিফর্ম ক্লাবের সেই সদস্যেরা: যাদের সঙ্গে ফিলিয়াস ফগ বাজি ধরেছে বিশ হাজার পাউণ্ড। সত্যিসত্যি ফগ নির্দিষ্ট পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে কিনা, তাই দেখবার জন্যই ফিক্সকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে ভদ্রলোকেরা। ছিঃ! ফিলিয়াস ফগের মত ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্রলোকের ওপরে এমন নীচ সন্দেহ ওদের? মনে মনে ফ্লালাগান

স্টুয়ার্ট র‍্যাল্ফ্ কোম্পানিকে একশো ধিক্কার দিল পাসেপার্তু। অনেক ভেবে সে স্থির করল এই ব্যাপার সে তার প্রভুকে জানাবে না। জানালে শুধু মহৎ উদার ভদ্রলোকটির অন্তরে আঘাতই দেওয়া হবে।

আর এই গোয়েন্দাটা অনিষ্ট তো কিছু করতে পারবে না! ও শুধু লক্ষ্য রাখছে ফগের গতিবিধির ওপরে। তা রাখুক।

* * *

মালাক্কা প্রণালী পেরুতেই জাহাজ চীন সমুদ্রে পড়ল। এইবার দেখা পাওয়া গেল সমুদ্রের অশান্ত মূর্তির। ঠিক ঝড় নয়—একটা এলোমেলো হাওয়া সব সময়েই এই দরিয়ার জলরাশিকে বিক্ষুব্ধ করে রাখে। সেই হাওয়ার খপ্পরে পড়ল রেঙ্গুন জাহাজও।

জাহাজ যতই অগ্রসর হয়, সেই হাওয়াটাও ক্রমে প্রবল হতে থাকে। গতি শ্লথ হয়ে আসে ক্রমশঃ। উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে দ্রুত চলবার সামর্থ্য কোন জাহাজেরই থাকে না, বিশেষ করে রেঙ্গুন জাহাজের তো নেই-ই। যে প্রণালীতে তৈরী হয়েছে জাহাজখানা, নৌবিজ্ঞান মতে সেই প্রণালীটাই ত্রুটিপূর্ণ।

ভাগ্য এবার বুঝি সত্যই বিরূপ ফিলিয়াস ফগের ওপরে। রীতিমত ঝড়ই শুরু হল ১লা নভেম্বর থেকে। দ্রুত চলবার চেষ্টা করলে জাহাজ ডুবেই যাবে, তাকে কোনমতে ভাসিয়ে রাখাই এখন হল কাপ্তেনের একমাত্র কাজ।

ফিলিয়াস ফগ তাকিয়ে আছে উদ্বেল সমুদ্রের পানে। মুখের চিরদিনের প্রশান্তি একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ৫ই তারিখে হংকং-এ ইয়োকোহামার স্টীমার ধরতে না পারলে যে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে, এটা যেন সে ভুলেই গিয়েছে।

হ্যাঁ, ব্রাডশ বলছে ৫ই নভেম্বর ইয়োকোহামার জাহাজ চলে গেলে তারপর আর এক সপ্তাহের মধ্যে কোন জাহাজ নেই। সুতরাং বিশ হাজার পাউণ্ড জেতা বা হারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ওই ৫ই-এর জাহাজ ধরতে পারা আর না-পারার ওপরে!

বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে তাতে পারার আশা কিছুমাত্র নেই।

তবু ফিলিয়াস ফগ নিরুদ্বেগ।

কিন্তু পাসেপার্তু প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সে অভিশাপ দিচ্ছে ঝড়কে,

সমুদ্রকে, যাবতীয় নাবিককে। তার বিশ্বাস—তার মনিবকে ফাঁকি দেবার জন্যই ওরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে একটা।

আর ফিক্স? সে আনন্দে ডগমগ। এ জাহাজ যতই দেরি করবে চীন সমুদ্রে, ইয়াকোহামার জাহাজ ধরতে পারার আশা ততই হবে ক্ষীণ। আর ৫ই ইয়োকোহামার জাহাজ যদি ধরতে না পারে ফিলিয়াস ফগ, তাকে সাত-সাতটি দিন বসে থাকতে হবে হংকং-এ। আর, প্রচুর সময় তাকে গ্রেফতার করবার। ওয়ারেন্ট ঠিক পৌঁছে যাবে ওই সাতদিনের ভেতর।

* * *

অবশেষে ঝড় থামল ৪ঠা নভেম্বর। বাতাসও ঘুরে দাঁড়াল! এদিকে পাল তুলে দেওয়া হল, ওদিকে স্টীমের চাপ তুলে দেওয়া হল চরমে। রেঙ্গুন হাওয়ার বেগেই ছুটতে লাগল।

কিন্তু তাতে সামান্যই উপকার ফিলিয়াস ফগের। ৬ই তারিখ ভোর পাঁচটার আগে ডাঙ্গা চোখে পড়ল না। অথচ ইয়োকোহামার জাহাজ নিশ্চয়ই ছেড়ে গিয়েছে এর আগেই।

ছয়টার সময় পাইলট* এসে রেঙ্গুনে উঠল। ফিলিয়াস ফগ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—ইয়োকোহামার জাহাজ কবে ছাড়বে, জানেন?"

"কাল সকালের জোয়ারে। কর্নাটিক জাহাজ।"

ফিলিয়াসের বুকের ভেতর যদি রক্তের তোলপাড় একটুও হয়ে থাকে, তার তিলমাত্র প্রকাশ বাইরে হল না। সে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল আবার—"কর্নাটিকের না কাল ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল?"

"তা ছিল। কিন্তু কর্নাটিকের বয়লার খারাপ হওয়ার দরুন তারই মেরামতে দুটো দিন কেটে গেল।"

ফিলিয়াস ফগ ধন্যবাদ দিয়ে সরে গেল। পাসেপার্তুও দাঁড়িয়ে দুজনের কথাবার্তা শুনছিল, সে এগিয়ে এসে খামোকাই বলল পাইলটকে—"আপনি বড় চমৎকার লোক পাইলট! ঈশ্বর ভাল করুন আপনার।"

তারপর সরে গেল পাসেপার্তু। পাইলট তো ভেবেই পায় না যে অপরিচিত যাত্রীর মুখ থেকে এতখানি শুভেচ্ছালাভ করবার মত কাজ কী সে করেছে।

---

* সমুদ্র থেকে জাহাজ বন্দরে নিয়ে আসা এবং বন্দর থেকে জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছে দেওয়া—এ কাজ হল পাইলটের।

৬ই সকালেই ফিলিয়াস ফগ হংকং পৌঁছালো। কর্নাটিক ছাড়বে ৭ই সকালে। প্রকৃতপক্ষে একটা দিনই দেরি দাঁড়িয়ে গেল। তা, এতে ভয় পাবার কিছু নেই! আটলান্টিক পাড়ি দেবার জন্য বাইশ দিন ধরে রাখা হয়েছে। ওর ভেতর থেকে যদি একটা দিনও বাঁচানো যায়। চীন সমুদ্রের এই একদিনের লোকসান পূরণ হয়ে যাবে।

আপাততঃ তীরে পৌঁছেই প্রথম কাজ হল আউদার পিতৃব্যের খোঁজ করা। ক্লাব হোটেলে আউদাকে রেখে এবং পাসেপার্তুর ওপরে তার দেখাশোনার ভার দিয়ে ফিলিয়াস ফগ বেরুলো সেই কাজে। পিতৃব্য জিজি মহাশয়ের নাম শেয়ার বাজারে সবাই জানে। কিন্তু তিনি তো দুই বৎসর আগেই এদেশ ত্যাগ করে গিয়েছেন!

"কোথায় গিয়েছেন, জানা আছে কারও!"

"হল্যাণ্ডে কোন জায়গায়। হল্যাণ্ডের সঙ্গেই তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য চলত কিনা! অবসর নিয়ে তাই সেই দেশে গিয়েছেন।"

ফিরে এসে ফিলিয়াস সেই খবরই দিল আউদাকে। আউদা দুচোখে অন্ধকার দেখল একেবারে। যার ভরসায় সে সাত সমুদ্র পেরিয়ে হংকং এল, সে চলে গিয়েছে আরও সাত সমুদ্র পারে হল্যাণ্ডে। এখন সে কোথায় যায়? কার কাছে আশ্রয় চায়?

নিরুপায় হয়ে ফগকেই সে জিজ্ঞাসা করে—"আমার এখন কি করা উচিত, মিস্টার ফগ?"

"ইউরোপে যাওয়া উচিত"—জবাব আসে নিরুদ্বেগ কণ্ঠস্বরে।

"কিন্তু আপনার ওপর আর কত অত্যাচার—"

"সে সব ঠিক আছে। পাসেপার্তু, কর্নাটিকের তিনখানা টিকিট কিনে আনো।"

* * *

বেলা তখন দশটা। পাসেপার্তু গিয়ে তিনখানা টিকিট কিনে ফেলল কর্নাটিকের। সে ভারী খুশী, কারণ আউদাকে এখানে রেখে যেতে হচ্ছে না। এই কদিনে আউদার বড় বেশী ভক্ত হয়ে পড়েছে সে। টিকিট কিনে বেরুবার সময় সে একটা নোটিশ দেখল—"মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে কর্নাটিক আর ৭ই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না, ৬ই সন্ধ্যা আটটাতেই যাত্রা করবে।"

তাহলে তো মনিবকে খবরটা দিতে হয়। অবশ্য সময় যথেষ্ট আছে। এখন সবে বেলা দুপুর। পাসেপার্তু ধীরে ধীরে শহর দেখতে দেখতে পথ চলতে লাগল।

আরে, এ কে? মিস্টার ফিক্স যে!

ফিক্স মরিয়া কর্নাটিক এখনো রয়েছে বন্দরে। এবং এইমাত্র সে খবর নিয়ে এল—ওয়ারেণ্ট এখনও আসেনি। এইবার তো তাহলে ফগ পালাচ্ছে। হংকং ছাড়লে আর তাকে ধরার কোন আশা বা উপায় নেই। দুশোখানা ওয়ারেণ্ট থাকলেও না। জাপানে বা আমেরিকায় সে ওয়ারেণ্ট অচল হবে যে!

সুতরাং, ফগকে আটকাবার একটা চরম চেষ্টা করা চাই এইবার। সুয়েজে আটকানো যায়নি, যায়নি বোম্বাই বা কলকাতায়, কিন্তু হংকং-এ আটকাতেই হবে। তা নইলে ফিক্সের চীন সমুদ্রে ডুবে মরাই যুক্তিযুক্ত।

ফগ যে একটা দস্যু, একথা পাসেপার্তুর কাছে প্রকাশ করে দিয়ে তার সাহায্য দাবি করার একটা কল্পনা কয়েকদিন থেকেই ফিক্সের মাথায় ছিল। সেই কল্পনা আজ সে কাজে পরিণত করবে। সেই উদ্দেশ্যেই পাসেপার্তুকে খুঁজতে সে কর্নাটিকের টিকিট আফিসের দিকে যাচ্ছে।

"আরে, কী খবর বল।"—নিঃস্পৃহভাবেই বলে ফিক্স।

"খবর আর কী। কর্নাটিকে আপনিও যাচ্ছেন তো আমাদের সঙ্গে?"—পরিহাসের লোভ সংবরণ করতে পারে না পাসেপার্তু।

"সে কথা কি এখন বলতে পারি? কাল সকালে কর্নাটিক ছাড়বে এর মধ্যে যদি মালিকের হুকুম এসে পড়ে—"

"কর্নাটিক কাল সকালে ছাড়বে না, ছাড়বে আজ সন্ধ্যা আটটায়। সেই খবরই তাড়াতাড়ি দিতে যাচ্ছি আমার মনিবকে।"

মনিব মানে মিস্টার ফগ তাহলে সে খবর এখনও পাননি। চকিতে ফিক্সের মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চমকে যায় যেন। একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। মোক্ষম একেবারে।

মুখে কোনও চঞ্চলতা প্রকাশ না করে ফিক্স বলল—"আরে, রাত আটটা তো? তাড়াতাড়ি করবার কী আছে? চল, একটা হোটেলে ঢুকে কিছু পান করে নেওয়া যাক। আজ যদি ছাড়াছাড়িই হয়, চিরদিনের জন্যই হতে পারে তো।"

এত বড় করুণ আবেদন অগ্রাহ্য করা যায় না। আর পানীয় জিনিসটা পাসেপার্তুকে আকর্ষণও করে বটে। তাড়াতাড়ি? না, তাড়াতাড়িও এমন কিছু নেই।

কিন্তু অনেক অলি-গলি ঘুরিয়ে একটা হোটেলে নিয়ে তুলল পাসেপার্তুকে। সেখানে খাদ্যপানীয় সামনে নিয়ে আলাপ জুড়ে দিল তার সঙ্গে—

"পাসেপার্তু, তোমার মনিবের সঙ্গে তোমার পরিচয় বেশী দিনের নয়, কি বল?"

"তা তো বলেছি মশাই। যেদিন পরিচয় হল সেদিনই লণ্ডন ছাড়লাম দুজনে।"

"আরে রাগ কর কেন! আমার বলবার উদ্দেশ্য এইটুকু যে তুমি ওঁর সম্বন্ধে আগে কিছুই জানতে না।"

পাসেপার্তু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। কথা বলার ফুরসত নেই, কারণ মুখে গেলাস।

"তাহলে আমি যদি বলি যে তোমার সঙ্গে পরিচয়ের দু এক দিন আগে তোমার মনিব ব্যাঙ্ক লুঠ করে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড—"

"কী?" গর্জন করে উঠল পাসেপার্তু—গেলাসটা মুখ থেকে টেবিলে ঠক্ করে নামিয়ে রেখে—

"শোনো, এসব রাগ করে দাবিয়ে রাখবার বা হেসে উড়িয়ে দেবার মত কথা নয়। তুমি সন্দেহ করেছিলে যে আমি রিফর্ম ক্লাবের ডিটেকটিভ। হ্যাঁ, ডিটেক্‌টিভই আমি বটে, কিন্তু ক্লাবের নই, খোদ ব্রিটিশ সরকারের। লণ্ডনের পুলিস কমিশনারের হুকুমে আমি অনুসরণ করছি ওই দস্যুর। গ্রেফতার করতে পারছি না এই কারণে যে ওয়ারেন্টখানা এখনও আমার হাতে পৌঁছোয়নি।"

পাসেপার্তু চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে। গুম হয়ে আছে একেবারে। ওত পেতে আছে যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে বাঘেরা থাকে। কতক্ষণ পরে সে বলল—"আমাকে এসব কথা বলার তাৎপর্য কী?"

"তাৎপর্য আর কিছু নয়—তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, তোমার একটা বিপদ ঘটে—এটা আমার ইচ্ছে নয়। বরঞ্চ তোমার কিছু উপকার হয়, এইটিই ইচ্ছে।"

"উপকার ?"—অপরিসীম তাচ্ছিল্য পাসেপার্তুর কথার সুরে।

"তুমি যদি আমায় সাহায্য কর, সে সাহায্য করা হবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে—যথেষ্ট পুরস্কার পাবে। এই উপকার আর কী! আর যদি সব জেনে শুনেও সাহায্য না কর, দস্যুর সহকারী বলে তোমাকেও আমি গ্রেফতার করতে বাধ্য হব।

ব্যস্, আর বলতে হল না। ওত-পাতা বাঘ সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপরে। ফিক্স ভূলুণ্ঠিত হল, তার ওপরে চড়ে যথেচ্ছ কিল ঘুষি হাঁকাতে লাগল পাসেপার্তু।

অনেকক্ষণ পিটিয়ে রাগ একটু পড়ল যখন, উঠে দাঁড়িয়ে পাসেপার্তু ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু যাওয়া হল না তার। ফিক্সও উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—"যেয়ো না। অনেকটা মদ পড়ে রইল। খেয়ে নাও।"

লোকটার সহিষ্ণুতা না নির্লজ্জতা—কোন্‌টার তারিফ করবে—বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে একবার তার দিকে তাকায় পাসেপার্তু। আর সেই সুযোগে ফিক্স এগিয়ে এসে গেলাসে মদ ঢেলে তার মুখের কাছে এগিয়ে ধরে। সোনা-রঙের টলটলে সুমধুর পানীয়, এর আকর্ষণ কি ঠেকিয়ে রাখা যায় ? ঢক্ করে সে গিলে ফেলল মদটা।

ফিক্স সঙ্গে সঙ্গেই আর এক গেলাস ঢেলে ফেলল। পাসেপার্তুও বসে পড়ল ধীরে ধীরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া—সে-খাওয়াতে যেন ষোল-আনা স্বাদ পাওয়া যায় না।

সে চুমুক দিচ্ছে গেলাসে, বোতলটা ঠিক তার হাতের কাছে রেখে দিয়ে ফিক্স একটু আড়ালে গেল। পরদা খাটানো আছে দরজায়, সেই পরদার আড়ালে।

সেখানে এক বিচিত্র পরিবেশ। লম্বা সরু ঘর একখানা। তাতে সারি সারি খাটিয়া পাতা। কতকগুলো খাটিয়া খালি, কতকগুলোতে মানুষ শুয়ে আছে এক একজন। বেহুঁশ অচৈতন্য তারা সবাই।

এটা আফিং-এর আড্ডা।

আফিং খাওয়ার জায়গা আরও ভেতরে। খাওয়ার বা ধোঁয়া নেবার। ধোঁয়া নিতে নিতে কেউ যখন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, আড্ডার পরিবেশকেরা ধরাধরি করে এনে খাটিয়ায় রেখে যায় তাকে।

এই ঘরেরই দেওয়ালে সারি সারি তাক। ধোঁয়া নেবার সরঞ্জাম থরে থরে সাজানো। একটা কলকের ভেতর থেকে এক ঢেলা আফিং বার করে নিয়ে হাতের তেলোতে গুঁড়িয়ে ফেলল ফিক্স। তারপর চট্ করে ফিরে এল পাসেপার্তুর কাছে। সে তখনও গেলাস মুখে ধরে ধীরে ধীরে তারিয়ে তারিয়ে চাখছে।

সে-গেলাস শেষ হওয়া মাত্র ফিক্স তার হাত থেকে গেলাসটা কেড়ে নিল, আর মদ ঢালতে ঢালতে বলল—"যা বলছিলাম, তা সত্যি বলে ভাবো নি তো তুমি? তোমার প্রভুভক্তিটা কেমন গভীর, তাই একটু বাজিয়ে দেখছিলাম আর কি! খুব খুশী হয়েছি। খু—উ—ব খুশী হয়েছি আমি।"

গেলাসের পরে গেলাস চলল এইভাবে। আফিং-এর গুঁড়ো মেশানো মদ। জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে এসেছে পাসেপার্তুর, তা নইলে সে লক্ষ্য করতে পারত যে ফিক্স তাকেই ক্রমাগত মদ গেলাচ্ছে, নিজে একটুও খাচ্ছে না।

কয়েকটা ঢেকুর উঠল। কয়েকটা হাই উঠল। তারপর চেয়ারে বসেই ঝিমুতে লাগল পাসেপার্তু। তারপর সে পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

ফিক্স বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে পরিবেশকেরা এসে ধরাধরি করে পাসেপার্তুকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল, শুইয়ে দিল একটা খাটিয়ায়।

দিন কেটে গেল, রাত কেটে গেল।

ক্লাব হোটেলে ফিলিয়াস ফগ প্রথমে বিস্মিত, তারপর উদ্বিগ্ন। কোথায় গেল পাসেপার্তু? বিদেশ বিভুঁই, কোন বিপদ আপদ ঘটল না তো?

টিকিট কিনতে গিয়েছিল, টিকিট কিনেছে তো?

রাত ভোর হল। সকালবেলার জোয়ারে কর্ণাটিক ছেড়ে যাওয়ার কথা। ফিলিয়াসকে তো ধরতেই হবে কর্নাটিক!

একখানা গাড়ি ভাড়া করে আউদাকে নিয়ে ফিলিয়াস জেটিতে এল। তার খুব আশা আছে যে পাসেপার্তু রাত্রে যে কারণেই ফিরতে না পেরে থাকুক—জাহাজ ছাড়বার সময়ে সে যেমন করেই হোক জাহাজঘাটে হাজির থাকবেই।

কিন্তু কই! জেটিতে পাসেপার্তুকে দেখা যায় না তো!

আর তার চেয়েও আশ্চর্য ! কর্নাটিক জাহাজকেও তো কোন দিকে দেখতে পাওয়া যায় না !

তবে কি বিনা নোটিশে অন্য কোন জেটি থেকে ছাড়বার ব্যবস্থা হয়েছে কর্নাটিকের ? পাসেপার্তু কি সেইখানেই অপেক্ষা করছে ?

এতখানি দায়িত্বজ্ঞানহীন তো পাসেপার্তু নয়। কী এ রহস্য ? যাই হোক, কোথায় আছে কর্নাটিক—সেটা জানা তো আগে দরকার ! একজন খালাসীকে জিজ্ঞাসা করল ফিলিয়াস।

"কর্নাটিক ?" লোকটা আকাশ থেকে পড়ল—"কর্নাটিক তো কাল সন্ধ্যায় ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ! সন্ধ্যা আটটায় !..."

আকাশ ভেঙে পড়ছে ? পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ?

আউদা জানে যে কর্নাটিক ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থ কী ? সে ব্যথিত দৃষ্টিতে ফিলিয়াসের দিকে তাকাল। তার ভয় হতে লাগল এই বুঝি লোকটা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়।

নাঃ তা কিছু হল না। এক মুহূর্ত ফিলিয়াস স্তব্ধ হয়ে রইল বটে, কিন্তু তারপর অবিচলিত ভাবেই খালাসীকে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু আজ সকালে যে ছাড়বার কথা ছিল !"

"ছিল। কিন্তু মেরামতির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কিনা ! এমনিই পুরো একদিন দেরি হয়ে গিয়েছে, অকারণে বসে থাকবে কেন ?"

"পাসেপার্তু তাহলে কর্নাটিকেই চলে গিয়েছে।"—বলে আউদা।

"আমাদের ফেলে ? তাহলে বলতে হবে সে পাগল হয়ে গিয়েছে হঠাৎ।"

একটি লোক অদূরে দাঁড়িয়ে এঁদের পর্যবেক্ষণ করছিল। সে এইবার এগিয়ে এসে অভিবাদন করল ফিলিয়াসকে। সে আর কেউ নয়, ফিক্স।

"মহাশয় বোধ হয় আমারই মত কর্নাটিক ফেল করেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বিনা নোটিশে এরকম কাণ্ড কোন জাহাজ যে করতে পারে—"

"নোটিশ আপনি আমি পাইনি বটে, কিন্তু তারা হয়ত নোটিশ দিয়ে থাকবে। বিনা নোটিশে সত্যিই এভাবে আগে ভাগে কোন জাহাজ ছাড়তে পারে না।"

"পরের জাহাজ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই যখন—চলুন শহরে ফেরা যাক। আপনি ছিলেন কোথায় ?"

"ছিলাম ক্লাব হোটেলে। কিন্তু অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমায় এক্ষুনি রওনা হতেই হবে ইয়োকোহামার দিকে !"

ফিক্সের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল—'উড়ে না কি ?'—অতি কষ্টে সে রসনাকে সংযত করল।

ফিলিয়াস তখন আউদাকে নিয়ে আবার একখানা গাড়িতে তুলেছে। ছুটে চলেছে ক্লাব হোটেলের দিকে। ফিক্স সঙ্গে যাবার কোন চেষ্টা করল না। কারণ ফগ যে আবার জাহাজ-ঘাটায় ফিরে আসবে, সে বিষয়ে সে সে নিঃসন্দেহ !

সে বরং ততক্ষণে নিজের কাজ গুছিয়ে রাখুক। নিজের কাজ অর্থাৎ পুলিস অফিসে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া। ওয়ারেণ্ট আসেনি এখনও। এলে যাতে এখানেই রেখে দেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থা করা।

ফিক্স বিশ্বাস করে না যে ফগ এক হপ্তার আগে হংকং থেকে বেরুতে পারবে। যদি পারে, তবে ইয়োকোহামা বা সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কোনও স্থানে সে-ওয়ারেণ্ট কোন কাজে লাগবে না। আর যদি বেরুতে না পারে, এক হপ্তার ভেতর এইখানেই তার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারবে।

ফিক্স গেল পুলিস অফিসে, ফগ ফিরে এল জাহাজঘাটায় আউদাকে হোটেলে রেখে।

দুই মাইল লম্বা জাহাজঘাটা। তন্ন তন্ন করে খুঁজল ফগ। না, কোন স্টীমারই দু চার দিনের ভেতরও ইয়োকোহামার দিকে যাবে না। পাল-তোলা জাহাজ দু একখানা ছাড়বে বটে, কিন্তু তাতে উঠে লাভ নেই কিছু। এ অঞ্চলের সমুদ্রে টাইফুন লেগেই আছে। ঝড়ের মুখে পাল গুটিয়ে ফেললে সে-সব জাহাজ নিশ্চল হয়ে পড়বে। আর পাল না গুটোলে তো সলিল সমাধি !

ফিক্সও ফিরে এল নিজের কাজ সমাধা করে। "আমিও মশাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—কোন জাহাজ-টাহাজ পাই কি না। কোন আশা নেই। চলুন হোটেলে ফিরে যাই।"

"আমায় যেতেই হবে ইয়োকোহামা"—ফগের একমাত্র উত্তর।

মুখ ঘুরিয়ে ফিক্স দন্ত বিকশিত করল।

একটি নাবিক দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল ফগকে। এইবার সে টুপি হাতে করে এগিয়ে এল—"মশাই কি বোট খুঁজছেন?"

"আছে তোমার?"

"তংকাদির। নয় থেকে দশ মাইল চলে ঘণ্টায়, যদি হাওয়া বেমোড় না হয়।"

"পাল-তোলা বোট?"

"তা তো বটেই।"

অবশেষে সেই পাল-তোলা বোটই নিতে হবে? সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে?

আর যখন উপায় নেই, তখন তাই হোক।

"কোথায় যাবেন বেড়াতে?"

"বেড়াতে ঠিক নয়, সমুদ্রযাত্রায়। আমায় নিয়ে যেতে হবে ইয়োকোহামায়।"

নাবিক হাঁ করে ফেলল একেবারে।

"না মশাই, অসম্ভব। সাড়ে ষোল শো মাইল সমুদ্র পেরুনো, এই শীতকালের ঝড়ঝাপটার মধ্যে, আমার বোট তো মাত্র বিশ টনের।"

"দেখ ভেবে। সাড়ে ষোলো শো নয়, মাত্র ষোল শো। দৈনিক একশো পাউণ্ড মজুরি দেব, আর ১৪ই তারিখ ইয়াকোহামাতে যদি আমায় সানফ্রান্সিস্কোর স্টীমার ধরিয়ে দিতে পার, তাহলে বাড়তি দুশো পাউণ্ড বকশিশ। দেখ ভেবে।"

ভেবে দেখবার জন্যই বোধ হয় নাবিক নিজের বোটে গিয়ে উঠল। এদিকে ফিক্সের অবস্থা অতি করুণ। এতক্ষণ ফগের সঙ্গে নাবিকের যতগুলি কথা হয়েছে, সব হাঁ করে গিলেছে লোকটা। নাবিক যখন আপত্তি করেছে বা অসুবিধা জানিয়েছে, তখন আশ্বস্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে ও। আবার ফগ যখন আপত্তি খণ্ডন করেছে বা অর্থের লোভ দেখিয়েছে, তখন আশঙ্কায় উদ্বেগে বুক ওর ঢিপ ঢিপ করেছে। কী হয়, কী হয়! সত্যিই আসামী ফসকাবে না কি?

নাবিক নেমে এল ক্রমশঃ।

"শুনুন মালিক! এই বোটে ইয়োকোহামা যাত্রা করার সাহস আমি কোনমতেই করতে পারি না। তাতে আমার নৌকা এবং নাবিকদের জীবন

সবই বিপন্ন হবে। বলা বাহুল্য, আপনাদেরও বিপন্ন হবার ঘোরতর আশঙ্কা থাকবে। সুতরাং ও-চিন্তায় কোন লাভ নাই। তার চেয়ে যদি জাপানের দক্ষিণ প্রান্তে নাগাসাকিতে আপনি যেতে চান—এগারো শো মাইল—আমি চেষ্টা করতে পারি। অথবা আরও ভাল হয় যদি আপনি সাংহাই যেতে রাজী হন। মাত্র আটশো মাইল।"

"নাবিক! আমার দরকার মার্কিন স্টীমার টরা, ইয়োকোহামা থেকে। নাগাসাকি বা সাংহাই গিয়ে আমি করব কী?"

"মার্কিন স্টীমারই ধরতে পারবেন আপনি। ও-স্টীমারের যাত্রা তো সাংহাই থেকেই শুরু হয়! ইয়োকোহামা বলুন, নাগাসাকি বলুন—সবই ওর মাঝপথের স্টেশন মাত্র।"

*　　　*　　　*

আধ ঘণ্টা বাদে তংকাদির যাত্রার জন্য তৈরী। দুশো পাউণ্ড আগাম দিয়েছে ফগ নাবিককে। সেই মালিক তংকাদিরের। সে আর অন্য চারজন নাবিকে মিলে বোট চালায়।

দুশো পাউণ্ড আগাম পেয়ে তাই দিয়ে খাদ্য পানীয় এবং অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনেছে বান্স্বি। মালিকের ওই নাম।

ফগ গিয়ে আউদাকে নিয়ে এসেছে। আউদার ঘোর দুশ্চিন্তা পাসেপার্তুর জন্য। ফগ বলল—"সে যদি কর্নাটিকে চলে গিয়ে না থাকে, তাহলে এখান থেকে তাকে খোঁজ করে আমাদের পেছনে পেছনে যাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তা করছি।"

প্রথমে পুলিস অফিসে গিয়ে পাসেপার্তুর চেহারার একটা বর্ণনা দেওয়া এবং তাকে সন্ধান করার ব্যয় বাবদ কিছু অর্থ জমা দেওয়া। তারপর ফরাসী কন্সলের কাছে গিয়ে ওইরকমই বর্ণনা দাখিল করা। এখানে আর টাকা জমা রাখবার দরকার হল না, কারণ ফরাসী নাগরিক পাসেপার্তু হংকং-এ এসে নিরুদ্দেশ হলে তাকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব তো ফরাসী কন্সলেরই।

জাহাজঘাটায় ফিরে আসতেই ফগ প্রথম যাকে দেখতে পেল সে ফিক্স। লটবহর সে নিয়েই এসেছে। তার একমাত্র ভয় শেষ মুহূর্তে বুঝি পাসেপার্তু এসে পড়ে। আসে যদি তাহলে তো ফিক্সের স্বরূপ সে এখনই প্রকাশ করে দেবে।

তাকে কোন কথা বলবার সময় না দিয়েই ফগ বলল—"মশাই, আপনিও তো সমুদ্র পেরুতে চাইছিলেন। যদি ভয় না পান, আমার বোটে আসতে পারেন। আমি খুশী হব আপনার উপকারে আসতে পেলে।"

ফিক্স তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—"আমি যে ওই উপকারটুকুই প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম আপনার কাছে।"

শুরু হল তৎকাদিরের যাত্রা! প্রথম দুটো দিন ভালই কাটল। অনুকূল পবনে সব কয়খানা পাল তুলে দিয়ে বোট দ্রুতবেগে অগ্রসর।

খাওয়ার সময় ফগ ফিক্সকেও ডাকল। না খেয়ে উপায় নেই। কিন্তু এই দস্যুটার অন্ন কোনমতেই যেন গলা দিয়ে নামে না ফিক্সের। কোনমতে উদর পূর্ণ করে সে ফগকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল—

"মহাশয়! (দস্যুকে সম্ভ্রমের সঙ্গে সম্বোধন করতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিল লজ্জায়)—মহাশয়! আপনার আতিথ্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু, মানে, যদিও আপনার মত অত দরাজ খরচা করবার মত অবস্থা আমার নয়, তবুও আমার খাওয়া-খরচাটা আমি বহন করতে চাই।"

"ও কথাই বলবেন না"—ফগের সংক্ষেপ উত্তর।

"কিন্তু না দিলে যে আমি শান্তি পাচ্ছি না!"

"নানাভাবে কত খরচাই তো হচ্ছে আমার। এটাও তারই ভেতর পড়বে।"— যে-সুরে ফগ কথা বলল—তাতে আর আপত্তি করবার সাহস ফিক্সের হল না।

ফিক্স সমস্ত জিনিসটা খতিয়ে দেখছে বোটের পেছনে বসে। দস্যু ইয়োকোহামায় যাচ্ছে, কিন্তু জাপানের কোথাও সে থাকবে না, এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। যাবে সে আমেরিকায়। সুবিস্তীর্ণ সেই মহাদেশের নিভৃত অথচ আরামপ্রদ কোন স্থানে আড্ডা গাড়বে—লুণ্ঠিত অর্থ নিরাপদে ভোগ করবার জন্য। তখন ফিক্সের কর্তব্য কী হবে? কর্তব্য হবে—ফগের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকা। যতদিন না মার্কিন সরকার ফগের বহিষ্কারের অনুমতি দেয়, ততদিন যে-কোন অছিলায় লেগে থাকা ওর সঙ্গে। আর অনুমতিটি পাওয়ামাত্র ক্যাঁক্ করে ফেরারী দস্যুকে গ্রেফতার করা।

শেষ মুহূর্তে হংকং-এর পুলিস অফিসে সে আবার নির্দেশ দিয়ে এসেছে—ওয়ারেন্ট ইয়োকোহামায় পাঠিয়ে দেবার জন্য।

(৭)

তিন দিন পর্যন্ত ভালই কাটল। সাংহাই আর মাত্র আড়াই শো মাইল। যে গতিতে তংকাদির যাচ্ছে, তাতে ১১ই তারিখ সাংহাই বন্দরে আমেরিকা-যাত্রী জাহাজ ধরতে পারা তার পক্ষে একরকম নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এইবার ভাগ্য বুঝি বিরূপ হল। বান্স্‌বি এসে মুখ কাঁচুমাচু করে নিবেদন করল—“কর্তা, আকাশের অবস্থাটা দেখছেন?”

“দেখেছি, মেঘলা।”

“ঝড় উঠবে বলে মনে হয়।”

“ওঠে যদি, কোন্ দিক থেকে উঠবে?”

“মনে তো হয়—দক্ষিণ থেকে।”

“তবে আর ভয় কী? ঝড়ের মুখে পাল তুলে দিয়ে আমরা দ্বিগুণ তিনগুণ বেগে ছুটতে পারব।”

বান্স্‌বি এসেছিল কূলে ভেড়াবার প্রস্তাব করবে বলে—কূল তার গতিপথ থেকে কোন সময়েই পাঁচ মাইলের চেয়ে বেশী দূর পড়েনি। কিন্তু ফগের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা শুনে সে মুখেই আনতে পারল না সে-প্রস্তাব। জাহাজ ধরিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে বলে সে স্বীকার করেছিল। বিপদের আভাসমাত্রেই পিছপা হয়ে নিরাপত্তা খুঁজতে যাওয়া কি প্রাণপণ চেষ্টার চিহ্ন?

ঝড় উঠল—টাইফুন। গ্রীষ্মঋতুর টাইফুন খানিকটা বজ্র-বিদ্যুৎ অপব্যয় করেই নিজের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে, কিন্তু শীতের টাইফুনের প্রকৃতি অন্যরকম। কতদিন ধরে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে ঝড় বইবে, তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই।

এল টাইফুন। সাগরের বুক দুলতে লাগল নাগরদোলার মত। পর্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠে পরের মুহূর্তেই নেমে যাচ্ছে পাতালের গহ্বরে। ঝপাৎ ঝপ—ঝপাৎ ঝপ্! তরঙ্গের আছাড়ি-পিছাড়ির শব্দ ছাড়া আর একটা মাত্র আওয়াজ কানে আসে—ঝড়ের আর্তনাদ—সোঁ সোঁ সোঁ-ও-ও।

তংকাদিরের অসীম বাহাদুরি। ঢেউ যত ওপরেই উঠুক, বোট আছে তার মাথার ওপরে। যত অতল গহ্বরেই নামতে হোক, ঢেউয়ের ঊর্ধ্বমুখী টানের সুযোগ নিয়ে সে আবার চোখের পলকে উচ্চাসনে উঠে বসছে।

জল? ডেকের ওপর জল উঠছে বইকি! কিন্তু খোলের ভেতর ঢুকতে পারছে না, এমন সুকৌশলে আঁটা সমস্ত রন্ধ্র।

পাল? ফিলিয়াস ফগ পাল নামাতে দেয়নি।

নামাতে দেয়নি বলে বোট তিনদিনের পথ একদিনে এসেছে ঝড়ের তাড়নায় উন্মত্তের মত ছুটতে ছুটতে। আবার নামাতে দেয়নি বলেই বহুবার টাল খেয়ে কাত হয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে উঠেছে আবার, বান্স্‌বি সুদৃঢ় হাতে হাল ধরে শেষ মুহূর্তেও তাকে সোজা করে তুলেছে।

আরোহীরা?

ফগ এক মুহূর্তের জন্যও ডেক ছেড়ে যায়নি। নাবিকদের সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে সমস্ত দুঃখকষ্ট বিপদ-আপদ। আউদা সুযোগ পেলেই ডেকের ওপর এসে বসেছে। যতক্ষণ সম্ভব কাটিয়েছে সেখানে। অবশেষে কেবিনে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে ফগের একান্ত অনুরোধে। ভয়? ভয় সে পেয়েছে বইকি! কিন্তু ভয়কে জয় করবার মানসিক শক্তি আছে এই অভিজাত রমণীর।

আর ফিক্স? সে একবারও কেবিন থেকে বাইরে আসেনি। এসে কী হবে? দস্যুর এই মুহূর্তে পালাবার কোন পথ খোলা নেই। কারাগারের চার দেয়ালের মতই এই উত্তাল জলরাশি তাকে আটকে রেখেছে। ফিক্সের শ্যেনদৃষ্টি এখন তার ওপর থেকে সরিয়ে নিলেও চলে।

হ্যাঁ, এক আশঙ্কা নৌকা ডুবতে পারে। ডোবে যদি, ফিক্স জানবে কর্তব্য করতে গিয়েই সে প্রাণ দিয়েছে। ওর চেয়ে বেশী গৌরব তো কোন ইংরেজই আশা করতে পারে না!

* * * *

১১ই সকাল। সাংহাই আর মাত্র একশো মাইল। কিন্তু সময়ও মাত্র আজকের দিনটাই। আজ সন্ধ্যাতেই সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর স্টীমার বন্দর ছেড়ে দরিয়াপারে ছুটবে। ওদিকে বাতাস পড়ে গেল। গতি মন্দীভূত তংকাদিরের। ১১ই দুপুর। সাংহাই মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। সময় মাত্র ছয় ঘণ্টা! কিন্তু বাতাসের বেগ আরও কমেছে, তংকাদির চলছে কি চলছে না। মাঝে মাঝে উপকূল থেকে এক একটা ঝাপটা আসে, তাতে বোট পাশের দিকে ধাক্কা খায়। তারপরই ঝাপটা হয়ত দূর থেকে দূরান্তরে বয়ে গেল। সমুদ্রবক্ষ হয়ে গেল শান্ত, নিস্তরঙ্গ।

তবু তংকাদির ঘণ্টায় নয় মাইল চলেছে। সন্ধ্যা ছয়টায় দূরত্ব আর মাত্র দশ মাইল। অবশ্য সাংহাই নদীর মোহানার দূরত্ব, সাংহাই বন্দরের দূরত্ব আরও দশ মাইল বেশী। বন্দরটা আবার মোহানা থেকে দশ মাইল উজানে নদীর কূলে কিনা!

সন্ধ্যা সাতটা, এখনও তিন মাইল।

বান্স্‌বি ঘন ঘন দিব্যি গালছে। এত পরিশ্রমের পরেও দুশো পাউণ্ড বকশিশটা বুঝি ফসকে যায়। ঠিক সাতটাতেই তো আমেরিকার স্টীমার ছাড়বে সাংহাই থেকে।

আরোহীদের নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। ফগ কি বাজি হারবেই? অবশ্য বাইরে থেকে দেখে বোঝবার জো নেই যে তার মনে কোন চঞ্চলতা এসেছে।

দিগন্তে এক ঝলক কালো ধোঁয়া।

ওই! ওই! আসে আমেরিকার স্টীমার।

স্টীমারের ফানেল দেখা যাচ্ছে—কালো, ভুতুড়ে।

"জাহান্নমে যাক স্টীমার"—বলে বান্স্‌বি হাল চেপে ধরে।

"কামান দাগো"—হুকুম করে ফিলিয়াস ফগ।

কুয়াশার সময় মাঝদরিয়ায় দাগা হয় এই ছোট্ট পিতলের কামানটি—যাতে অন্য জলযান তংকাদিরের সান্নিধ্য টের পেয়ে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য দূরে সরে যেতে পারে।

বোটের মাস্তুলে ব্রিটিশ পতাকা বরাবরই আছে, সে-পতাকা মাস্তুলের মাঝামাঝি নামিয়ে দিল ফগ, এটা বিপদের সংকেত।

ওদিকে ছোট্ট কামানের বুম্ বুম্ ধ্বনিত হয়ে উঠল সমুদ্রের বুকে।

* * *

আমেরিকান স্টীমার জেনারেল গ্রাণ্টের দিক থেকে কর্নাটিকের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক একবার।

৬ই তারিখ সন্ধ্যায় স্টীমার ছাড়বে-ছাড়বে করছে, এমন সময় উস্কো-খুস্কো চেহারার একটা লোক ঢুলুঢুলু চোখে দ্রুতপদে অথচ মুহুর্মুহুঃ টাল খেতে খেতে কোনমতে এসে স্টীমারে উঠে পড়ল।

এ হল পাসেপার্তু।

তাকে আফিং-এর আড্ডায় অজ্ঞান করে রেখে ফিক্স চলে এল যখন, খাটিয়ায় বেহুঁশ হয়ে সে পড়ে রইল সারাদিন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তার নেশা ফিকে হয়ে এল। পরিবেশকেরা তাকে টেনে তুলে দিল। কারণ একটা খরিদ্দারকে তারা বেশীক্ষণ জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাখতে পারে না। তাতে ভিড় জমে যায় মেঝের ওপর।

পায়ের ওপর কোনমতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই পাসেপার্তুর মনে পড়ে গেল—আজ এই সন্ধ্যাবেলাতেই তো কর্নাটিক ছেড়ে যাওয়ার কথা। মনিব নিশ্চয়ই এতক্ষণ মিসেস্ আউদাকে নিয়ে স্টীমারে উঠে বসেছেন।

পাসেপার্তু টলতে টলতে, পড়ি-কি-মরি অবস্থায় স্টীমারঘাটে ছুটল। অভাগার একথাটা মনে পড়ল না, অর্থাৎ মনে করবার মত মানসিক স্থৈর্য তখনও তার ফিরে আসেনি যে জাহাজ যে কাল সকালে না ছেড়ে আজ সন্ধ্যায় ছাড়ছে—এ খবরটাই সে তার মনিবকে জানায়নি। জানাবে বলে হোটেলের দিকে যাচ্ছিল—এমন সময়ে সেই পাপিষ্ঠ গোয়েন্দাটার পাল্লায় পড়ে—

যাক, ওসব কথা তার মনে পড়ল না। মনিব নিশ্চয়ই নিজের কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়েছেন—এই বিশ্বাসে সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটি কোনরকমে খুঁজে নিয়ে দেহটাকে লম্বা করে দিল আবার।

সারারাত গভীর নিদ্রার ফলে পরদিন সকালে সে শয্যা ত্যাগ করল সুস্থ শরীর নিয়ে। উঠেই সে ছুটল মনিবের এবং আউদার কেবিন খোঁজবার জন্য। না জানি মনিব কী ভেবেছেন রাত্রে তার দেখা না পেয়ে।

কেবিন খুঁজে পেল অতি সহজে। কিন্তু সে-কেবিন খালি। ফিলিয়াস ফগ বা আউদা কেউ স্টীমারে আসেননি।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল পাসেপার্তু। এতক্ষণে তার মনে পড়ল যে স্টীমারের যাত্রার সময় পালটে গিয়েছে—এ খবরটাই সে তার মনিবকে দেয়নি। তাঁরা তাহলে এখনও হংকং-এর ক্লাব হোটেলেই বসে আছেন পলাতক পাসেপার্তুর প্রতীক্ষায়। হায় হায়! অমন সদাশয় প্রভুর সর্বনাশ করে ছেড়েছে পাসেপার্তু। বিশ হাজার পাউণ্ড তাঁর পকেট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে চীনের দরিয়ায়। নিজেকেও সেই দরিয়ার জলে বিসর্জন দেবার একটা প্রলোভন তাকে প্রবলভাবে পেয়ে বসল।

সমুদ্রজলে আত্মবিসর্জন অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে করল না, অত সহজে

হতাশ হওয়ার লোক সে নয়। কী এখন করা উচিত, সেই চিন্তা করতে করতে সে প্রাতরাশের সন্ধানে চলল। কাল সারাদিন আফিংযুক্ত সুরা ছাড়া কিছুই উদরে যায়নি।

আর একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপারও সে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখেছে—সেখানে কিছু নেই। অথচ টিকিট কেনবার পরে বিস্তর অর্থ তার কাছে ছিল, সে-সব ওই আফিংখানার পরিবেশকদের পকেটেই ঢুকেছে নিশ্চয়। বেশ, এজন্যও ফিক্সই দায়ী হয়ে রইল তার কাছে। একদিন-না-একদিন তার সঙ্গে পাসেপার্তুর বোঝাপড়া হবেই।

তবে বাঁচোয়া এই যে পকেট শূন্য হলেও অনাহারে মরবার ভয় নেই। যাত্রীদের খানাপিনার বাবদেও অর্থ জমা দেওয়া হয় টিকিট ক্রয়ের সময়ে। সুতরাং সেদিকে দিয়ে নিশ্চিন্ত পাসেপার্তু। খেতে লাগল স্বাভাবিক আহারের তিনগুণ। কারণ সে তো তিনজনের খাবার জন্যই জমা দিয়েছে অর্থ! তার নিজের, মনিব ফগের, এবং অতিথি আউদার! দুইজন যদি না এসে থাকে, সে একাই খাবে তিনজনের খাদ্য।

স্টীমার ইয়োকোহামায় ভিড়ল। নামতে হল পাসেপার্তুকে। কারণ কর্নাটিক তো এর বেশী আর যাবে না!

এইবার শুরু হল জীবনধারণের যুদ্ধ। পাসেপার্তু খায় কী? জাহাজে একাই তিনজনের খাবার খেয়েছে বটে, কিন্তু তা তো আর পেটে জমা নেই। উদর এখন আকাশের মত ফাঁকা।

ফাঁকা পকেটও।

ভিক্ষা? কল্পনাতেই বমি আসে। কাজ? হঠাৎ পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? তারপর,—এই নবাবপুত্রোচিত দামী পোশাক অঙ্গে নিয়ে যা-তা কাজের জন্য উমেদারি করতে গেলে—চাকরিদাতারা ভাববে লোকটা নিছক ঠাট্টা করছে।

পোশাকের কথা মনে হতেই একটা বুদ্ধি মাথায় এল। এই দামী পোশাক বেচে দিয়ে অল্প দামের পুরোনো কাপড়-জামায় যদি শ্রীঅঙ্গ সজ্জিত করা যায়, কিছু নগদ অর্থ হাতে আসবে, দুই একদিন খেয়ে বাঁচা যাবে। পক্ষান্তরে, দীনহীনের মত কাপড় পরে চাকরির চেষ্টায় বেরুলে সাফল্যের আশাও বেশী।

যে ভাবনা, সেই কাজ। আধ ঘণ্টার ভেতর ভোল বদল করে ফেলল পাসেপার্তু, এবং যে নগদ অর্থটা পাওয়া গেল, তা দিয়ে ভোজন করে নিল পেট ভরে। এইবার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাববার উপযুক্ত অবস্থা এসেছে মনের।

শহর ছেড়ে শহরতলি, শহরতলি ছেড়ে গ্রামাঞ্চল—বেশ খানিকটা টহল দিয়ে এল পাসেপার্তু। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুখ্যাতি আছে। নিজে নিঃসম্বল এবং বিপন্ন না হলে সে সৌন্দর্য দেখে তৃপ্তিও পেত সে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কোন কিছুতেই তৃপ্তি সে পেতে পারে না।

শহরের দিকে ফেরবার পথে একটা বৃহৎ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল তার।

অভূতপূর্ব আকর্ষণ!

জাপানী বাজিকর সম্প্রদায়

স্বত্বাধিকারী—মাননীয় উইলিয়াম বাটুলকার

আমেরিকা যাত্রার পূর্বে শেষ খেলা!

দীর্ঘ নাসা! দীর্ঘ নাসা!

টিঙ্গু দেবতার অনুগৃহীত দীর্ঘনাসা খেলোয়াড় সংঘ!

অভূতপূর্ব আকর্ষণ!

খেলোয়াড়? আমেরিকা যাত্রা? পাসেপার্তু দাঁড়িয়ে পড়ল।

এক সময়ে সে নিজেও সার্কাসের খেলোয়াড় ছিল। এবং বর্তমানে তারও আমেরিকা যাত্রার প্রয়োজন আছে। কারণ জাপানে তার দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। মনিবের সঙ্গেই হোক, বা একা একাই হোক—দেশে তাকে ফিরতেই হবে, এবং দেশে ফেরবার পথ আমেরিকার মধ্য দিয়েই।

বিজ্ঞাপনের স্থানটিও যেখানে, বাটুলকার মহাশয়ের অধিষ্ঠানও সেখানে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতেই পাসেপার্তু চাকরি পেয়ে গেল।

খেলা অনেক রকম দেখাতে হবে। যেমন পাসেপার্তু মাথায় ভর দিয়ে পা উঁচু করে দাঁড়াবে, এক পায়ের তেলোতে একটা লাটিম ঘুরবে বনবন করে, অন্য পায়ের তেলোতে একখানা খোলা তরোয়াল খাড়া হয়ে থাকবে। কিংবা নাকে বাঁশের লম্বা চোঙ্গ লাগিয়ে পাসেপার্তু চিত হয়ে শোবে; সেই

চোঙের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে অন্য খেলোয়াড় কসরত দেখাবে নানা রকম। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যাবেলাতেই খেলা শুরু হল। সব কসরতেই পাসেপার্তু বাজিমাত করে চলল। দীর্ঘদিন অভ্যাস নেই যদিও, বাটুলকার কোম্পানির সব সভ্যকেই সে অতিক্রম করে গেল অনায়াসে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এল টিঙ্গু দেবতার প্রিয় খেলা দীর্ঘনাসার কসরত। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল পাসেপার্তু, তার নাকের ওপর চিমটের মত লাগিয়ে দেওয়া হল এক দশ-বারো ফুট লম্বা অতিরিক্ত নাক। সেই নাক উঁচু হয়ে রইল আকাশে। তার ওপর উঠল আর এক খেলোয়াড়। তারও সেইরকম লম্বা বাঁশের নাক, তার ওপরে আবার নাকওয়ালা তৃতীয় খেলোয়াড়—এইরকম চলেছে আর কি!

দর্শকেরা চড়চড় করে হাততালি দিচ্ছে। কৌতূহলের বশে চোখ তেরছা করে প্রেক্ষাগৃহের দিকে একবার তাকাল পাসেপার্তু।

দেখেই উঠল চমকে। নড়ে উঠল দীর্ঘনাসার পিরামিড। মাননীয় বাটুলকার আড়াল থেকে চাপা গলায় তর্জন করে উঠলেন। কিন্তু কে শোনে সে তর্জন? পাসেপার্তু আর একবার ভাল করে তাকাবার লোভ সংবরণ করতে পারল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ভাল করেই দেখল, এবং তার ফলে যত্নরচিত দীর্ঘনাসার পিরামিড হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল একেবারে।

হইহই, অট্টহাসি, টিটকারি, বাটুলকারের ব্যাঘ্রগর্জন—সব তুচ্ছ করে মঞ্চ থেকে এক লাফে নেমে পড়েছে পাসেপার্তু এবং ছুটে চলে গিয়েছে প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে, যেখানে একটি সুবেশ ভদ্রলোক বসে খেলা দেখছেন, এক সুবেশা সুন্দরীকে পাশে নিয়ে।

"প্রভু মাননীয় মিস্টার ফগ! আমায় ক্ষমা করুন! রক্ষা করুন আমাকে! আমার মত নির্বোধ, আমার মত মূর্খ, আমার মত জন্তু—"

বাটুলকার ওদিকে একেবারে খাপ্পা। তার খেলা পণ্ড হল। টিঙ্গু দেবতার নিজস্ব সম্প্রদায়ের যা দুর্নাম হল, তার আর প্রতিকার নেই। পাসেপার্তুর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সে নিজের ক্ষতিপূরণ এবং টিঙ্গুর তৃপ্তিবিধান করবে।

অবশ্য বেশীদূর গড়াতে পেল না ব্যাপারটা। পাসেপার্তুর ছালের

চাইতে মূল্যবান কিছু অর্থাৎ দুশো পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ পেয়ে নিরস্ত হয়ে গেলেন মাননীয় বাট্‌লকার।

সন্ধ্যার আগেই "জেনারেল গ্রাণ্ট" স্টীমার এসে ইয়োকোহামায় থেমেছে। আউদাকে একটু শক্ত মাটিতে ঘুরিয়ে আনবার জন্য তাকে নিয়ে তীরে উঠেছে ফগ। স্টীমার এখানে দাঁড়াবে কয়েক ঘণ্টা।

আউদারই কৌতূহল হল দীর্ঘনাসার কসরত দেখবার জন্য। তারই ফলে—একান্ত দৈবাৎ পাসেপার্তুর উদ্ধার ঘটল।

পরদিন আউদার মুখেই তংকাদিরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ শুনল পাসেপার্তু। শুনল যে কে একটা মিস্টার ফিক্সও সহযাত্রী ছিল ফগের। তা সে এই ইয়োকোহামাতেই স্টীমার থেকে নেমে গেল।

শুনে আউদার সামনে কোন চাঞ্চল্য সে প্রকাশ করল না এবং ফিক্স যে স্টীমার ছেড়ে গিয়েছে, সে কথাও সে বিশ্বাস করল না। খোঁজ করতে করতে এক সময়ে জাহাজের পেছন দিকে গিয়ে ধরল ফিক্সকে, এবং ধরামাত্রই এক বিরাশি-সিক্কা ওজনের ঘুষিতে ধরাশায়ী করল ফিক্সকে।

মার খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল ফিক্স; ঠিক যেভাবে সেদিন উঠেছিল হংকং-এর আফিম খানায়। বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করল না বরং মুখে হাসি টেনে এনে বলল—"মিছেই রাগ করছ। এখন আর আমি মিস্টার ফগের শত্রু নই, বরং বন্ধু।"

"বন্ধু ?"—অপরিসীম ঘৃণায় পাসেপার্তুর নাসা কুঞ্চিত।

"এই অর্থে বন্ধু যে এখন থেকে আমি মিস্টার ফগের যাত্রা-পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করব না। বরং তাঁর সাহায্যে করব যাতে পথের সব বাধা কাটিয়ে তিনি শীঘ্র শীঘ্র ইংরেজ এলাকায় পৌঁছুতে পারেন। বুঝছ না ? ইংরেজ এলাকায় না পৌঁছোলে আমি তাঁকে গ্রেফতার করতে পারছি না। এখানে এসে ওয়ারেণ্ট আমি পেয়ে গেছি, এই স্টীমারেই এল। কিন্তু জাপানী এলাকায় বা মার্কিন মুল্লুকে যতক্ষণ থাকব,—সে-ওয়ারেণ্ট তো ছেঁড়া কাগজের সামিল।"

ফিক্সের যুক্তি এবং সংকল্প বিশেষ যে রেখাপাত করল পাসেপার্তুর অন্তরে, তা নয়, তবু সে তখনকার মত ফিক্সকে ছেড়ে চলে গেল। না গিয়েই বা করবে কী ? সত্যি সত্যি সে তো আর খুন করে ফেলতে পারে না পাপিষ্ঠ গোয়েন্দাটাকে !

কিন্তু খুন করে না ফেলুক, ও যাতে আর অনিষ্ট করতে না পারে, সেদিকে সাবধান হতে হবে। মনিবকে ওর প্রকৃত পরিচয় জানানো উচিত? না, অনুচিত? খুব সমস্যার কথা।

মনিব অবশ্য খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। কিন্তু বলা তো যায় না। অনেক সময় ঠাণ্ডা লোকও গোঁয়ারতমি করে ফেলে। বিশেষ বাজির ব্যাপারটার সাফল্য যখন স্বাধীনভাবে যাওয়া-আসার ওপরে নির্ভর করছে, তখন সেই যাওয়া-আসার বিঘ্ন যে করবে, সে তো ক্ষমার যোগ্যই নয় ফগের চোখে! যদিই হঠাৎ গুলি চালিয়ে বসেন মনিব? পৃথিবী-পরিক্রমা তো সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হবে।

তার চেয়ে ও যখন বলছে—এখন আর ও কোনরকম শত্রুতা করবে না, দেখাই যাক না ওর রীতিচরিত্র। মনিবকে বলা? সে তো যখন খুশী বললেই হবে।

এইরকম চিন্তার পর পাসেপার্তু এখন নীরব থাকাই প্রশস্ত বিবেচনা করল। ফিক্সের সঙ্গে আগেকার সে অন্তরঙ্গতা আর ফিরে আসবার কোন উপায়ই ছিল না, দু'জনে অপরিচিতের মতই ব্যবহার করে পরস্পরের সঙ্গে। আর ফগ আর আউদা তো জানেই না যে ফিক্স এখনও স্টীমারেই আছে।

* * *

জাপানের দরিয়া পার হয়ে মার্কিন স্টীমার মার্কিন দেশের দিকে ছুটল।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো পৌঁছোলো তরা ডিসেম্বর। ফগের হিসাব অনুযায়ী এই তারিখেই পৌঁছোবার কথা। একদিনও বাঁচাতে পারে নি ফগ, আবার একদিনও পিছিয়েও পড়েনি।

আশি দিনের বাষট্টি দিন পেরিয়ে গেছে, বাকী মাত্র আঠারো দিন। তবে—পথে যদি গুরুতর বাধা বিঘ্ন কিছু না ঘটে, এই আঠারো দিনেই ফগের লণ্ডন পৌঁছানো অসম্ভব না হতে পারে। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো থেকে নিউইয়র্ক একটানা রেলপথ রয়েছে, প্যাসিফিক রেলরোড তার নাম। সাঁইত্রিশ শো ছিয়াশি মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ, অতিক্রম করতে লাগে সাত দিন।

আঠারো দিনের সাত দিন গেল, বাকী থাকে এগারো দিন। কিন্তু ব্রাড়শ'র মতে আটলান্টিক মহাসাগর পেরুতে ফগের প্রয়োজন হবে নয় দিন। কাজেই যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে।

না থাকলেও, তাতে দমবার পাত্র ফিলিয়াস ফগ নয়। স্টীমারের গতি দ্রুততর করার মন্ত্র সে জানে। এঞ্জিনিয়ারদের প্রসন্ন করতে পারলে নয় দিনের মধ্যে দুটো দিন বাঁচানো মোটেই শক্ত নয়।

*　　　*　　　*

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতেও আউদাকে নিয়ে তীরে উঠল ফগ; এবং দুচার পা যেতে না যেতেই—কী আশ্চর্য দেখতে পেল সেই মিস্টার ফিক্সকে—তংকাদিরে এবং জেনারেল গ্রাণ্টে যে তাদের সহযাত্রী ছিল। ইয়োকোহামায় নেমে গিয়ে সে আবার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে উদয় হল কোথা থেকে? তারা সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল।

কিন্তু তাদের চাইতে যেন শতগুণ বেশী আশ্চর্য হয়ে গেল ফিক্সই। "কী রকম! আমিও তো জেনারেল গ্রাণ্টেই এলাম! মানে, নেমেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ইয়োকোহামার আফিস আমাকে পত্রপাঠ আবার স্টীমার ধরতে পাঠিয়ে দিল। এবার হুকুম—একেবারে লণ্ডন যেতে হবে।"

"তা হোক, কিন্তু একই জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পেরুলাম, একবারও দেখা হল না?"—আউদা এই নির্দোষ প্রশ্নটি না করে পারে না।

"তাতে অবাক হবার তেমন কিছু নেই ভদ্রে! এত বড় স্টীমার—আর আমি নিরিবিলি থাকতেই ভালবাসি—তা যাক সে কথা—আপনারাও লণ্ডন যাবেন? এক সাথে যাওয়ার অনুমতি যদি দেন, জানব আমার ওপর আপনার পূর্ব অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ আছে।"

*　　　*　　　*

প্যাসিফিক রেলপথের মাঝামাঝি জায়গায় ওমাহা জংশন। তার কিছু আগে রকি পর্বতের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলেছে। হঠাৎ ঘড়াং ঘড় শব্দ করে ট্রেন থেমে গেল।

ফগ, আউদা আর ফিক্স রেলের কামরায় তাস খেলতে ব্যস্ত। সময় কাটাবার এই ফিকির তারা বার করেছে। আউদা ইংরেজী-প্রথায় শিক্ষালাভ করেছে। এবং সে শিক্ষার এমন সব অঙ্গ আছে, যা শিখতে পুঁথির বা শিক্ষকের দরকার হয় না। এক নম্বর ধরা যেতে পারে ক্রিকেট, দু নম্বর তাস। সুতরাং আউদাও তাসখেলা জানে।

হঠাৎ ঘড়াং করে ট্রেন থেমে যেতেই পাসেপার্তু লাফিয়ে নামল। এক অতলস্পর্শী খাদের ওপরে এক ঝুলন্ত পুল। এই পুলেরই ওপর দিয়ে

রেলের লাইন। এবং এই পুল নাকি এমন ভাবে জখম হয়েছে যে তার ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

যাত্রীরা হইহই করে উঠল। অসম্ভব বলে কোন জিনিস আছে? আমেরিকায়? ওই পুলের ওপর দিয়েই গাড়ি নিয়ে যেতে হবে।

গাড়ির এঞ্জিনিয়ার বলল—শতকরা পঞ্চাশ সম্ভাবনা আছে বটে—গাড়ি নিয়ে নিরাপদে ওপারে পৌঁছোবার। তেমনি শতকরা পঞ্চাশ আবার—"

ওটা আর কেউ শুনতে চাইল না। নিরাপদে পৌঁছোবার আধাআধি সম্ভাবনা আছে শুনেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল—"যে পঞ্চাশ সেই ষাট এবং যে ষাট সেই সত্তর।"

"আবার যে সত্তর, সেই আশি বা নব্বই। শতকরা নব্বই পরিমাণ আশা যেখানে আছে, সেখানে ইতস্ততঃ করে কোন্ ভীরু? চালাও ট্রেন।"

পাসেপার্তু এক ফাঁকে বলে উঠল—"ট্রেন চলুক, কিন্তু তার আগে যাত্রীরা হেঁটে পার হয়ে নিক না! যাত্রীদের প্রাণগুলো আগে নিরাপদ হোক। ওটার ভেতর আর শতকরা আঁক না-ই বা কষা হল!"

"আরে, এটা কোথাকার ভীরু?"—চারদিক থেকে ধিক্কার—শুনছ না শতকরা নব্বই সম্ভাবনাই নিরাপদে পেরুবার?"

ওদিক থেকে একজন বলল—"যে নব্বই, সেই একশো! এঞ্জিনিয়ার বলেছে—আমাদের নিরাপদে পেরুবার সম্ভাবনা শতকরা একশোই। সুতরাং অকারণে কেন আমরা হেঁটে মরব?"

পাসেপার্তুর যুক্তি মাঠে মারা গেল। যাত্রীরা উঠে বসল গাড়িতে। এঞ্জিনিয়ার গাড়িখানাকে এক মাইল পিছিয়ে নিয়ে এল। তারপর তাকে ছোটালো সমুখপানে। সে কী ছুট! তীর যেমন ছোটে ধনুক থেকে, বুলেট যেমন ছোটে বন্দুক থেকে, উল্কা যেমন ছোটে আকাশে—তেমনি ছুট। সেতুর ওপর এসে পড়ল চোখের পলকে তারপর একটা সাঁ-আ-আ শব্দ। লাইনের ওপর দিয়েই কি গেল গাড়ি? না, সেতুর এ-প্রান্তে এসে একটা লাফ দিল ওপার লক্ষ্য করে?

যা-ই করুক, ট্রেন ওপারে পৌঁছোলো, এবং সেই মুহূর্তে সমস্ত পুলটা চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ে তলিয়ে গেল অতল খাদে।

আরোহীরা জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখল, এবং চেঁচিয়ে বলল—

"এঞ্জিনিয়ার ঠিকই বলেছিল যে শতকরা একশো ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে—"

পাসেপার্তু মনে মনে বলল—"আমেরিকা আজব দেশ।"

৬ই ডিসেম্বর—ইণ্ডিয়ানদের* দেশের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলেছে। এরা এখনও রীতিমত হিংস্র, সুযোগ পেলেই ট্রেন আক্রমণ করে এবং যাত্রীদের হতাহত করে তাদের অর্থ ও জিনিসপত্র লুঠ করে। এদের হাত থেকে রেলপথ ও রেলযাত্রীদের রক্ষা করবার জন্য মাঝে মাঝে রেলপথের পাশেই কেল্লা গড়তে হয়েছে সরকারকে। ফোর্ট কিয়ার্নি এইরকম কেল্লা একটা।

কিয়ার্নি স্টেশন তখনও প্রায় দশ মাইল দূরে। হঠাৎ দমাদ্দম গুলিবৃষ্টি ট্রেনের ওপর। চলন্ত গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠল ইণ্ডিয়ানেরা—সংখ্যায় তারা কয়েক শত। ট্রেনের এঞ্জিনিয়ারকে প্রথমেই গুলি করল, সে পড়ে গেল। নিহত হল, না আহত, কে তা বলবে। ট্রেন যেমন ছুটছিল, ছুটতে থাকল তেমনি। কে থামায়?

হাতাহাতি লড়াই চলেছে কামরায় কামরায়। ফগ, ফিক্স, পাসেপার্তু, এমন কি আউদাও গুলি চালাচ্ছে। রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে কামরার ভেতরে।

একটা কথা উঠল—"গাড়ি ছুটছে, যদি ছুটতে ছুটতে কিয়ার্নি স্টেশন পার হয়ে যায়, তবে আর রক্ষা নেই। কিয়ার্নির ওধারে সবই ইণ্ডিয়ানদের এলাকা, এবং ফোর্ট কিয়ার্নির ওধারে নিকটে আর অপর কোন কেল্লা নেই।" কিন্তু গাড়ি তো থামছে না! থামাবার কোন উপায়ও দেখা যায় না। ইণ্ডিয়ানদের গুলিতে এঞ্জিনিয়ার আহত বা নিহত হয়েছেন, থামাবে কে?

তীরবেগে ছুটেছে ট্রেন, আর পাঁচ মিনিটের ভেতর কিয়ার্নি স্টেশন অতিক্রম করে যাবে। তখন আর যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাবার কোন উপায়

* কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেই ও দেশকে ইণ্ডিয়া বা ভারত বলে ভুল করেছিলেন। আদিম অধিবাসীদের নামও দিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান। কালক্রমে আসল ভারত আবিষ্কৃত হলেও ওই আদিম অধিবাসীদের নাম ইণ্ডিয়ানই রয়ে গিয়েছে। তবে ভারতবাসী ইণ্ডিয়ানদের থেকে পৃথক করবার জন্য ওদের বলা হয় রেড ইণ্ডিয়ান। কারণ ওদের গায়ের রং তামাটে লাল।

থাকবে না। কাতারে কাতারে রক্তলোলুপ ইণ্ডিয়ান এসে হানা দেবে ট্রেনের ওপর।

ফগ লাফিয়ে বেরুলো—"আমি থামাব গাড়ি।"

বাধা দিয়ে পাসেপার্তু বলল—"না, না, মালিক ও কাজ আমার! আমায় করতে দিন।" ফগকে ঠেলে গাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দিয়ে সে ছুটে বেরুলো।

ট্রেন যতখানি লম্বা, ঠিক ততখানি লম্বা একটা বারান্দা আছে ট্রেনের গায়ে। কামরায় কামরায় ছেদ আছে, কিন্তু বারান্দা একটানা। এক ছুটে বারান্দার শেষ মাথা পর্যন্ত এসে গেল পাসেপার্তু। কিন্তু এবার? এঞ্জিনের সঙ্গে তো যোগ নেই এই বারান্দার! এঞ্জিনে পৌঁছোনোর উপায় কী?

দরজা খুলে পাদানিতে নামল পাসেপার্তু। ঝড়ের বেগে হাওয়া বইছে। সে-হাওয়া বরফের কুচিতে ভরতি। সেই সন্ধ্যা থেকেই তুষারপাত হচ্ছে, কামরার ভেতর গরমে বসে এতক্ষণ তা টের পায়নি আরোহীরা।

তুষার-ঝটিকায় চোখ বুজে আসে, হাত-পা হয়ে আসে আড়ষ্ট। চোখ মেলে থাকা, হাত-পাকে ইচ্ছামত খেলানোই দারুণ কষ্টসাধ্য কাজ, তা অন্য চেষ্টা করবে কেমন করে?

কিন্তু তা বললে চলে কই?

পাদানি বেয়ে যতদূর আসা সম্ভব, সে এল হাতল ধরে ধরে। বাঁদিকে তিন ফুট দূরে বাফার, সেখানে এঞ্জিনের সঙ্গে কামরার যোগ হয়েছে। দু দিক থেকে দুটো লোহার চোঙ্গা এসে মুখোমুখি স্পর্শ করেছে পরস্পরকে তার পাশেই গাড়ির সঙ্গে গাড়ি বাঁধবার মোটা লোহার শিকল।

একবার ওই বাফারে উঠে বসতে পারলে—

ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটেছে গাড়ি। সনসন হাওয়া, চোখে ঢোকে বরফকুচি, তারই ভেতর হাতল ধরে বাঁ দিকে একটা ঝুল দিল পাসেপার্তু। পড়ে মরবার আশঙ্কা যেখানে শতকরা একশো সেখানে মরণভয় তুচ্ছ করে সে দিল নির্ভয়ে লাফ।

কার বরাতের জোরে কে জানে—কিন্তু পাসেপার্তু শতকরা একশো ভাগ মৃত্যু সম্ভাবনাকে পরাস্ত করে বাফারের ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেখানে কি দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব? বসতে পারলে তবে বাফারটাকেই আঁকড়ে ধরা যায়।

পাসেপার্তু বসল, এক হাতে বাফার ধরল, আর একহাতে শিকলের জোড় খুলল। আর খোলামাত্রই এঞ্জিন বায়ুবেগে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেল তার সামনে থেকে।

গাড়িখানাও কিছুদূর গেল তার পিছু পিছু। কিন্তু গতি তার কমে এল ক্রমশঃ, ঠিক কিয়ার্নি স্টেশনের দোরগোড়াতে এসে সে থেমে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ চোখে আঁধার দেখল পাসেপার্তু, বাফারের ওপর থেকে উলটে পড়ে গেল লাইনের ওপরে।

বন্দুকের শব্দ তখনও মুহুর্মুহুঃ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে গাড়ির ভেতর থেকে। সেই শব্দ শুনে ফোর্ট কিয়ার্নি থেকে সৈন্যেরা বেরিয়ে এল অস্ত্র নিয়ে। তাদের আসতে দেখেই ইণ্ডিয়ানেরা, হাতের মাথায় যা পেল, তাই নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আর দেখতে দেখতে তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দক্ষিণমুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন গাড়ি থেকে আরোহীরা সবাই নেমে এল প্লাটফর্মে। আহত হয়েছে অনেকে, তবে ফগ বা ফিক্স বা আউদা নয়। কিন্তু পাসেপার্তু? সে কোথায়? তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাকে পাওয়া গেল না কোথাও।

তেমনি পাওয়া গেল না আরও দুটি আরোহীকে।

সন্দেহ নেই যে ইণ্ডিয়ানেরা পালাবার সময় এই তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

ফোর্ট কিয়ার্নিতে একশোজন সৈনিক নিয়ে একজন মেজর থাকেন। তাঁর কাজ এই ধরনের উৎপাত নিবারণ করা।

সসৈন্যে তিনি প্লাটফর্মে উপস্থিত, ফগ গিয়ে তাঁকে বলল—"মহাশয়, তিনজন যাত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের ইণ্ডিয়ানেরা ধরে নিয়ে গেছে নিশ্চয়। তাদের উদ্ধারের জন্য তো যাওয়া দরকার।"

মেজর চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর কাতর হয়েই বললেন—"মানবতার প্রশ্ন যদি তোলেন, তাহলে যাওয়া যে দরকার—তাতে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু মানবতার প্রশ্নই একমাত্র প্রশ্ন নয়। দক্ষিণ দিকে ইণ্ডিয়ানদেরই অখণ্ড রাজত্ব। ঘর অরণ্য, হাতিঘাসের* দুর্ভেদ্য বন।

* একরকম ঘাস যার ভেতর হাতি ঢুকলে তলিয়ে যায়।

সেখানে গিয়ে তাদের খুঁজে বার করতে হলে একশো লোকের কাজ নয়, দরকার অন্ততঃ দু হাজারের। এই একশোকে, সেখানে ঢোকানো মানে তাদের জীবনের আশা বিসর্জন দেওয়া। তিনজনের জন্য আমি একশো লোককে মেরে ফেলব—এইটাই কি আপনি সংগত মনে করেন ?"

ফগ শুধু বলল—"তাহলে আমি একাই যাই।"

"একা ?" চমকে উঠলেন মেজর।

"তিনজনের জন্য একশো লোকের জীবন বিপন্ন করা হয়তো যায় না, একজনের জীবন অবশ্যই বিপন্ন করা যায়।"

মেজর লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করলেন—"না, একা আপনাকে যেতে হবে না।" তারপর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—"ত্রিশজন ভলান্টিয়ার ! মৃত্যুভয় যথেষ্টই আছে এটা নিশ্চিত জেনে এই অভিযানে যেতে যারা প্রস্তুত, তারা এগিয়ে এস।"

ত্রিশজন কেন, একশোজনই এগিয়ে এল। বাছাই করে নিতে হবে এখন।

অবশেষে বাছাই-করা ত্রিশজন সৈনিক নিয়ে একজন লেফ্টেনাণ্ট তৈরী হয়ে গেল অভিযানে যাত্রা করবার জন্য। ফগ তাদের পুরোভাগে। সৈন্যদের সম্বোধন করে সে বলল—"হারানো যাত্রীদের যদি খুঁজে বার করতে পার—আমি পাঁচ হাজার পাউণ্ড উপহার দেব তোমাদের।"

ফগ চলে যাচ্ছে ! ফিক্স প্রমাদ গনল। এই বিজন অরণ্য-প্রদেশে একবার ঢুকতে পারলে তখন সে যদি আর না ফেরে ? ফিক্সের কি কর্তব্য নয়—ওর পেছনে পেছনে যাওয়া ?

কিন্তু ফগ এসে এইসময় বলল—"মিস্টার ফিক্স ! মিসেস আউদাকে আমি স্টেশনেই রেখে যাচ্ছি। আপনি তাঁর খোঁজ-খবর একটু যদি করেন, বাধিত হব।"

ফিক্সের অন্তরাত্মা চিৎকার করে বলতে চাইছিল—"না, না, না।" কিন্তু মুখে সে কিছুই বলতে পারল না। ঘাড় নেড়ে নীরবে সে সায় দিতে বাধ্য হল।

আউদাকে বোঝাতে মোটেই বেগ পেতে হল না ফগের। একবার সে শুধু বলেছিল—"আমিও যাব।" কিন্তু তাতে যে অভিযাত্রীদের দ্রুতগতিই ব্যাহত হবে শুধু, এটা বুঝতে পেরে পরের মুহূর্তে নিজেই বলল—"না,

তাতে আপনাদের অসুবিধাই হবে। ভগবান আপনাকে ও হারানো বন্ধুদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন। আমার জন্য ভাববেন না যেন। এখানে আর আমার ভয় কী?"

* * *

চলে গেছে অভিযাত্রীরা। চাঁদের আলোয় পলাতক ইণ্ডিয়ানদের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে বরফের ওপর। এখনও বরফের নীচে ঢাকা পড়ে যায়নি।

চলে গেল ফিলিয়াস ফগ—ব্যাঙ্ক-দস্যু দুর্বৃত্ত। ডিটেক্‌টিভ্ ফিক্স তাকে বাধা তো দিলই না, বরং তারই আশ্রিতা এক অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর (হয়ত সেও দস্যুদলেরই লোক) রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে তাসখেলার ডামির মত ঠুঁটো হয়ে বসে রইল কিয়ার্নি স্টেশনের প্লাটফর্মে। হাওয়া ভীষণ ঠাণ্ডা, চোখে ঢোকে তুষারকণা, দু পা পিছিয়ে ওয়েটিংরুমে আগুনের পাশে বসলে যথেষ্ট আরাম পাওয়া যায়, তা সে যেতে পারছে না। ঐ বিস্তীর্ণ চন্দ্রালোকিত প্রান্তর—যার দিগন্তে কালো অরণ্যানী অস্পষ্ট-আভাসে এই রাত্রিবেলাতেও চোখে পড়ে—তার দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না এক মুহূর্তের জন্যও। তার আসামী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ঐ প্রান্তরের ওপারে, ওই বনানীর ভেতরে। সে কি আর ফিরে আসবে?

ওয়েটিংরুমের আরামে বসে শান্তি পাচ্ছে না আউদাও। রহস্যময় খেয়ালী পুরুষ এই ফগ নিজের অজান্তেই এভাবে আকৃষ্ট করেছে আউদাকে যে, বিপজ্জনক এই অভিযানে তার সম্ভাব্য জীবনসংশয়ের কথা চিন্তা করে সে প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কায় শিউরে উঠছে। পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টা অন্তর সে বার বার বেরিয়ে আসছে ঘরের ভেতর থেকে। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখছে প্রান্তরের দিকে। ফিক্সই তাকে প্রবোধ দিয়ে, অনুনয় করে ফেরত পাঠাচ্ছে ওয়েটিংরুমের আশ্রয়ে।

রাত কেটে গেল। ফিরল না অভিযাত্রীরা।

সকালবেলায় এঞ্জিনখানা ফিরে এল। সৌভাগ্যক্রমে এঞ্জিনিয়ার মারা পড়েনি, আহত হয়ে মূর্ছা গিয়েছিল শুধু। জ্ঞান ফিরে আসতেই সে এঞ্জিনের সম্মুখগতি রোধ করেছে এবং ফেলে-আসা ট্রেনের সন্ধানে পেছনপানে ফিরেছে।

এসেই সে যাত্রী-বোঝাই গাড়িগুলিকে এঞ্জিনের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে যাত্রা করার উদ্যোগ করল। ফিক্স গিয়ে তাকে বলল এই সময়—"কালকের আক্রমণে তিনজন যাত্রী নিখোঁজ হয়েছে, তাদের খোঁজবার জন্য গিয়েছে আর একজন যাত্রী, এই কেল্লার ত্রিশটি সৈনিককে নিয়ে। আপনি কি চার চারজন যাত্রীকে ফেলে চলে যাবেন ?"

"ট্রেন কারও জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। আপনি যদি যান তো গাড়িতে উঠে পড়ুন।" আহত এঞ্জিনিয়ার বিরসকণ্ঠে জবাব দিলেন।

ট্রেন চলে গেল। ফিক্স বা আউদা কেউ গেল না।

ট্রেন চলে যাওয়ার পরে একজন স্থানীয় লোক চুপি চুপি এসে একটা প্রস্তাব করল ফিক্সের কাছে। ফিক্স শুধু বলল—"এখন বলতে পারছি না। তুমি কোথায় থাক, বলে যাও। দরকার হলে পরে তোমার কাছে যাব।"

সারাদিন দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এবার ফোর্টের মেজরও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রথম দলের ত্রিশজন সৈনিকের খোঁজে আরও কিছু সৈনিক দিয়ে দ্বিতীয় একটা দল পাঠানো উচিত কিনা, ভাবতে লাগলেন খুব গম্ভীরভাবেই। 'আজকের দিনটা দেখি'—এই সিদ্ধান্ত করলেন শেষ পর্যন্ত।

প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি দূর দিগন্তে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। আউদা ছুটে বেরিয়ে এল প্লাটফর্মে। এসেছে নাকি ? ফিরেছে তারা ?

সত্যই তারা ফিরেছে। হারানো যাত্রীদের নিয়েই নিরাপদে ফিরেছে। যুদ্ধ বড় একটা হয়নি। ইণ্ডিয়ানেরা প্রথম আক্রমণেই বন্দীদের ফেলে পালিয়েছিল।

ফিক্স হাঁক ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু পরক্ষণেই বিষণ্ণ হয়ে দেখল ওই ত্রিশজন সৈনিকের ভেতর বণ্টন করে দেবার জন্য ফগ মেজরের হাতে পাঁচহাজার পাউণ্ড তুলে দিচ্ছে। হায় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড! তোমার টাকা এইভাবে অপব্যয় হচ্ছে ? সঙ্গে সঙ্গে কমে আসছে ফিক্সের কমিশনও ?

পাসেপার্তুর উদ্ধারের জন্যই গেল পাঁচ হাজার পাউণ্ড। তার চেয়েও গুরুতর কথা, ট্রেন ফেল করতে হল। পরবর্তী ট্রেন তিনদিন পরে। রোজ এ-লাইনে গাড়ি চলে না, অত যাত্রী আসবে কোথা থেকে ? জনবিরল অঞ্চল এসব।

একেই সময়ের অভাব ফগের, তার ওপর এই অপ্রত্যাশিত বিলম্ব

এখন তো এখান থেকে বেরুনোর কোন উপায়ই দেখা যাচ্ছে না! বাজিটা সত্যিই মারা গেল এবার। ফগ অবিচলিত, কিন্তু পাসেপার্তু পাগল হওয়ার যোগাড়। তার জন্যই বারবার মনিব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এবার তো তাঁর সর্বনাশ নিশ্চিত। কুক্ষণে সে চাকরি করতে এসেছিল মিস্টার ফগের কাছে।

ফিক্স এসে চুপি চুপি কি বলল ফগকে। দুজনে তক্ষুনি ছুটল। সকালবেলায় যে লোকটি এসেছিল, তারই বাড়িতে। মাঠের ভেতর তার বাড়ি। তার আছে একখানি স্লেজগাড়ি। এইটির কথাই সে তখন ফিক্সের কাছে বলছিল এসে।

দুখানা মোটা কড়ি কাঠ সমান্তরালভাবে মাটিতে ফেলে তার ওপর একখানা মাচা গড়ে তোলা হয়েছে। মাচা মাটি থেকে এক ফুট উঁচু। মাস্তুল আছে। তাতে খাটানো মস্ত পাল। বরফে ঢাকা সমতল প্রান্তর—প্রেইরি এর নাম। এ সব প্রান্তর শত শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। স্লেজগাড়ি অনুকূল বাতাসে পাল তুলে দিতে পারলে ঠিক হাওয়ার বেগেই অতিক্রম করে যায় এই সব প্রেইরি। ট্রেনের বা স্টীমারের চেয়ে ঢের বেশী দ্রুতগামী।

ফগ বেঁচে গেল। এক কথায় স্লেজ ভাড়া নিয়ে আউদাকে আনবার জন্য ছুটে চলে গেল স্টেশনে।

ফগ, আউদা, পাসেপার্তু আর ফিক্সকে নিয়ে স্লেজগাড়ি রওনা হল। যে মালিক, সেই চালক। নাম তার মাজ। কিয়ার্নি থেকে ওমাহা দুশো মাইল দূর। "চার ঘণ্টায় পারবে পৌঁছুতে?"—প্রশ্ন করে ফগ।

"যদি স্লেজের কোন অংশ ভেঙে না যায়, বা হাওয়া যদি পড়ে না যায়।" উত্তর দিল মাজ।

বরফে-ঢাকা প্রেইরি যেন জমে-যাওয়া বিশাল হ্রদ একটা। তার ওপর দিয়ে বনবন করে ছুটছে স্লেজ। হাওয়ার জোর এত বেশী যে মাস্তুল বেঁকে যাচ্ছে। বরফ-হাওয়ায় কুঁকড়ে যাচ্ছে আরোহীরা। যে-কয়টা গরম কাপড় সঙ্গে ছিল, সব দিয়ে আউদাকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। পাসেপার্তুর মুখখানা দেখাচ্ছে সূর্যের মত লাল। আর ফগ?—স্লেজের গতি থেকে একটা বাজনার সুর উঠছে যেন, সেই সুর ফগ তন্ময় হয়ে শুনছে। শুনতে শুনতে এক সময় সে বলল—"কোমলের 'পা' আর কড়ির 'সা' বাজছে ওই সুরে।"

ব্যস্, স্লেজ যতক্ষণ চলল—দ্বিতীয় আর কোন কথা নয় ফগের মুখ থেকে।

বেলা একটায় ওমাহায় পৌঁছোলো স্লেজ। এখান থেকে শিকাগোর অনেক ট্রেন। মাজকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনে চড়ে বসল ফগেরা।

শিকাগোতে গাড়ি বদল করে নয়শো মাইল দূরবর্তী নিউইয়র্কের দিকে ধাবিত হল যাত্রীরা। হিসাব করে দেখল ফগ, সব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তারা কাল সন্ধ্যা নাগাদ নিউইয়র্কে পৌঁছে যাবে। লিভারপুলের স্টীমার ছাড়বার আগেই হয়ত পৌঁছুতে পারবে। ফোর্ট কিয়ার্নিতে ওই বিপদ না ঘটলে যে সময়ে নিউইয়র্ক পৌঁছুতে পারত, তার ঘণ্টা দশেক পরে। এমন কিছু মারাত্মক ক্ষতি নয়, সব দিক ভেবে দেখলে পরে।

১১ই তারিখ সন্ধ্যায় রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে নিউইয়র্কে পৌঁছোলো ট্রেন। প্রায় কুনার্ড লাইনের স্টীমারের জেটির ওপরেই স্টেশন। এই কুনার্ড লাইনের "চায়না" স্টীমারেতেই যেতে হবে ফগকে।

ভাগ্য !

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে চায়না ছেড়ে গিয়েছে।

(৮)

চায়না শুধু শুধুই যায়নি, ফগের সাফল্যের শেষ আশাটুকু গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! আউদা যখন মুষড়ে পড়ছে ফগের বিপর্যয়ে, পাসেপার্তু যখন মাথার চুল ছিঁড়ছে প্রভুর সর্বনাশে, ফগ নিজে তখন অচঞ্চল। আউদাকে যথাসম্ভব আরামে বসিয়ে দিয়ে সে বন্দরের এদিক থেকে ওদিকে ছুটছে—অন্য যানের সন্ধানে। নিউইয়র্কে বহু জাহাজ লাইনের মিলন ক্ষেত্র, অন্ততঃ সাতটা স্টীমার কোম্পানির জাহাজ ছাড়ে এখান থেকে। কিন্তু কোনটার জাহাজ কাল ছেড়ে গিয়েছে, কোনটার পরশু ছাড়বে, কেউ আবার লণ্ডন বা লিভারপুলে যাবে না, যাবে ফরাসী উপকূলের কোন বন্দরে। কাজেই তাদের দ্বারা কোন উপকারের আশা নেই ফগের।

কিন্তু ছোটখাটো স্টীমার—ব্যক্তিগত মালিকানার বাণিজ্যতরী ? তাও তো অনেক ছাড়বার কথা এখান থেকে !

ছাড়ছে বইকি ! কিন্তু সবই পালতোলা জাহাজ। হাওয়া সব সময় অনুকূল থাকবে এই ঋতুতে, এমন আশা কখনোই করা যায় না ! আর তা যদি না থাকে, তবে এ সব বাণিজ্যতরী অচল হয়ে থাকবে দরিয়ার বুকে।

বহু খোঁজাখুজির পর একখানা সুদৃশ্য মজবুত স্টীমারের দেখা মিলল। ধোঁয়া উঠছে তার ফানেল দিয়ে, তার মানে সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। স্টীমারখানার নাম "হেনরিয়েটা।"

ফগ একটা নৌকোয় চড়ে হেনরিয়েটাতে গিয়ে উঠল।

কাপ্তেনের খোঁজ করতেই একজন মধ্যবয়সী লোক সামনে এসে দাঁড়াল। রুক্ষ মেজাজের লোক—দেখলেই বোঝা যায়। বড় বড় চোখ, লাল লাল চুল, গায়ের রং তামাটে। 'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধ', মানুষটাকে প্রথম দৃষ্টিতেই গোঁয়ারগোবিন্দ বলে মনে হবে।

"কাপ্তেন"—জিজ্ঞাসা করে ফগ।

"আমিই।"

"আমি ফিলিয়াস ফগ, বাড়ি লণ্ডন।"

"আমি আনড্রু স্পীডি, বাড়ি কার্ডিফ।"

"আপনার স্টীমার ছাড়ছে ?"

"এক ঘণ্টার ভেতরে।"

"যাচ্ছেন—?"

"বোর্দো।"

"যাত্রী আছে ?"

"না। কখনও নিই না যাত্রী। বড় তর্ক করে।"

"গতিবেগ ?"

"এগার থেকে বারো মাইল। 'হেনরিয়েটা'র নাম সবাই জানে।"

"আমায় লিভারপুল নিয়ে যাবেন ? আমাকে এবং অন্য তিনজনকে ?"

"লিভারপুল ? চীন বললেন না কেন ?"

"লিভারপুলই বলেছি।"

"না।"

"যত ভাড়াই দিই, কিছুতেই না ?"

"যত ভাড়াই দিন, কিছুতেই না।"

"কিন্তু হেনরিয়েটার মালিকেরা—"

"আমিই মালিক।"

"আমি জাহাজখানাই ভাড়া নেব আপনার কাছে।"

"না।"

"আমি কিনব জাহাজখানা আপনার কাছ থেকে।"

"না।"

হেনরিয়েটার আন্‌ড্রু স্পীডি তংকাদিরের বান্‌স্‌বি নয়। এ-যাবৎ সর্বক্ষেত্রে অর্থবলে সর্বসমস্যা কাটিয়ে এসেছে ফগ। এইবার অর্থবল হার মানল।

কিন্তু আটলান্টিক তো পেরুতেই হবে! আশি দিনের মাত্র নয় দিন বাকী। এখনও যদি যাত্রা করা না যায়—

হয় এই হেনরিয়েটা, নয় তো কোন বেলুন। বেলুন তাকে লণ্ডনে নিয়ে ফেলবে কি কুমেরুতে, কিছু ঠিক নেই। আর বেলুনই বা হাতের মাথায় কোথায় এই মুহূর্তে ?

ফগের মাথায় একটা মতলব এল। কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করল—"তা হলে আমাদের বোর্দোতেই নিয়ে চলুন।"

"না, মাথা পিছু দুশো ডলার দিলেও না।"

"আর যদি মাথা পিছু দু হাজার ডলার দিই ?"

এতক্ষণে স্পীডি টলল। একটু ভাবল, ঢোঁক গিলল একবার।

"চারজন ?"

"চারজন।"

"মাথা পিছু দু হাজার ডলার ?"

"মাথা পিছু দু হাজার ডলার।"

"আমি নটার সময় স্টীমার ছাড়ছি।"

"নটার আগেই আমরা স্টীমারে উঠছি।"

* * *

পরের দিন. ১৩ই ডিসেম্বর। সকালবেলাতেই কাপ্তেন স্টীমারের ছাদের

ওপরকার মাচায় গিয়ে বসল। সেখান থেকেই সমুদ্র লক্ষ্য করা তার কাজ।

এ কাপ্তেন অবশ্যই সেই কাপ্তেন স্পীডি ?

মোটেই না। এ কাপ্তেন ফিলিয়াস ফগ।

ব্যাপারখানা কী ?

ব্যাপারখানা এই যে লিভারপুলে পৌঁছানো একান্ত প্রয়োজন ফিলিয়াস ফগের। অথচ স্পীডি তাকে নিয়ে যাচ্ছে বোর্দোতে। বোর্দো থেকে লিভারপুল বা লণ্ডন পৌঁছাতে আরও দুটো দিন লাগবে। সে-সময় কোথায় ?

সুতরাং স্টীমারে উঠেই ফিলিয়াস ব্যাঙ্ক নোট ছড়াতে লাগল নাবিকদের ভেতরে। এ-নাবিকেরা কেউই স্পীডির কাছে বেশীদিন কাজ করেনি, বেশীদিন কাজ করবার আশাও করে না। তাদের কী আসে যায়, স্টীমার বোর্দোর বদলে লিভারপুল গেলে ?

প্রচুর ঘুষ নিয়ে এঞ্জিনিয়ার থেকে খালাসী পর্যন্ত প্রত্যেকে ফগের কাছে দাসখত লিখে দিল। তার ফলে, ১২ই রাত্রে সেই যে নিজের কেবিনে ঢুকল স্পীডি ১৩ই সকালে সেখান থেকে আর বেরুতে পারল না। কেবিন বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

প্রথমটা বিস্ময় ; তারপর শাসানি। সে কী তর্জন আর গর্জন। দশটা বাঘ যেন তড়পাচ্ছে কেবিনের ভেতর। "চাবুক মেরে চামড়া তুলে নেব, গুলি করে মেরে ফেলব, হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেব" ইত্যাদি। যাত্রী ফগ ও মাইনে করা নাবিক—সকলের মস্তক লক্ষ্য করে সমানভাবে অভিসম্পাতবর্ষণ। ঘন্টার পর ঘন্টা এক ভাবে চেঁচিয়ে যেতে লাগল লোকটা। পাসেপার্তুকে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতে হল স্পীডির কেবিনে সে যতক্ষণ জানালার বাইরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল, প্রতিমুহূর্তে তার আশঙ্কা হচ্ছিল—সাঁ করে একটা বুলেট বুঝি বেরিয়ে আসে কাপ্তেনের পিস্তল থেকে।

কাপ্তেনের ধমকচমকে কেউই ভয় পেল না। সব দায়িত্ব ফগ নিজের ওপরেই নিয়েছে। কারও কোন বিপদ ঘটবে না, আশ্বাস দিয়েছে জোর গলায়। মজা এই যে যার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে, অন্য সবাইও তাকে সহজেই বিশ্বাস করে, বিশেষ সে যদি অর্থবান লোক হয়।

ফগের আত্মপ্রত্যয় তো বিশ্বগ্রাসী! তা নইলে সে স্বচ্ছন্দে জাহাজ চালাবার ভার নেয়?

বস্তুতঃ সে যে রকম নিপুণভাবে স্টীমার চালাবার নির্দেশ দিতে লাগল, তাতে ফিক্সের ধারণা হল যে এই ব্যাঙ্ক দস্যুটা পূর্ব জীবনে পদস্থ নাবিকও ছিল নিশ্চয়।

হেনরিয়েটা ঘণ্টায় এগারো থেকে বারো মাইল চলে কাপ্তেন স্পীডিই বলেছিল। নিউইয়র্ক থেকে লিভারপুল তিন হাজার মাইল। হাতে আছে ন দিন। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাওয়ার একটু আশা আছে বইকি যদি স্টীমার কোন দুর্ঘটনায় না পতিত হয়।

ফিক্স মনে মনে বলে—"রোসো না! প্রথমে ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ, তারপর মাঝদরিয়ায় এই জাহাজ লুঠ। লিভারপুল কেন, আরও কিছু দূরে তোমায় পৌঁছে দেব আমি।" ফিক্সের মাথায় অস্ট্রেলিয়া ঘুরছে, যেখানে দুর্দান্ত দস্যুদের দ্বীপান্তর দেওয়া হয়।

গতিপথ পরিবর্তন করে হেনরিয়েটা লিভারপুলের দিকে যাচ্ছে। ১৩ই তারিখ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলের পাশ দিয়ে চলে গেল। এখানকার আবহাওয়া চিরদিনই খুব খারাপ। ব্যারোমিটার নেমে গিয়েছে। অর্থাৎ, আবহাওয়াতে পরিবর্তন আসন্ন।

আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল। হাওয়া ঘুরে গেল দক্ষিণ-পুবে। এক একটা দুর্ভাগ্য। পাল গুটিয়ে ফেলে বাষ্পের ওপর ষোল-আনা নির্ভর করতে হল এবার।

ঝড় উঠল ক্রমশঃ। যোজনজোড়া ঢেউ সব সমুদ্রবক্ষ উদ্বেল করে তুলল। স্টীমার দোল খেতে লাগল। গতি ব্যাহত হতে লাগল। "আরও কয়লা চাপাও" হুকুম দিল ফগ "স্টীমের চাপ যথাসম্ভব বাড়িয়ে দাও।"

তাই হল। সর্বোচ্চ স্টীমে হেনরিয়েটা ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলল। ফগের সৌভাগ্য, ঝড় তত প্রচণ্ড নয়। প্রচণ্ড হলে এভাবে, ঢেউয়ের সঙ্গে স্টীমের যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলতে পারত না, স্টীমার কাত হয়ে পড়ত।

সে রকম কিছু হল না, এবং ঝড়ও ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এল। কিন্তু ১৬ই তারিখ এঞ্জিনিয়ার এসে জানাল—"আর মাত্র দু দিনের কয়লা আছে।" অবস্থাটা হল এই রকম। আনড্র স্পীডি শুধু স্টীমের উপর নির্ভর করে

স্টীমার চালায় না, অন্ততঃ অর্ধেকটা নির্ভর করে পালের ওপরে। আগাগোড়া স্টীম ?—সে তো ভয়ানক খরচের ব্যাপার !

তাই যাত্রা শুরু করবার সময় কখনোই সে যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা সঙ্গে নেয় না। কখনো পাল, কখনো কয়লা—পৌঁছুতে যদি দুদিন দেরি হয়, কী এমন ক্ষতি ?

এঞ্জিনিয়ারের রিপোর্ট শুনে ফগ বলল—"ভেবে দেখব। কিন্তু তুমি স্টিমের চাপ একটুও কমিও না। যতক্ষণ এক কুচি কয়লা আছে, বয়লারে ঢালো।"

আরও দুদিন পুরো স্টিমে চলতে থাকল হেনরিয়েটা। কিন্তু তারপর ? সমুদ্রের মাঝখানে নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে তো ? হাওয়া ভয়ানক-রকম উলটো বইছে। সেদিক থেকে একটুও সাহায্য পাওয়া যাবে না। পাসেপার্তু হতাশ হয়ে পড়ল একেবারে, এত কষ্টেও বাজিটা জেতা গেল না। জেতা তো গেলই না, উপরন্তু বাজি জিততে গিয়ে দরাজ হাতে খরচ করে করে ফগ সর্বস্বান্ত হলেন। অনেকগুলো অপব্যয় তো পাসেপার্তুর দরুনই করতে হয়েছে। এবং এই ফিক্স! দু হাজার ডলার ভাড়া দিয়ে এটাকে কেন টেনে আনা নিউইয়র্ক থেকে ? এত তাড়াতাড়ি মনিব ব্যবস্থা করেন যে পাসেপার্তু প্রতিবাদ করবার সময় পায় না। অবশ্য প্রতিবাদের সাহসও যে তার আছে, তাও নয়।

১৮ই এঞ্জিনিয়ার জানাল—এই দিনটা কোনমতে চলতে পারে কয়লায়। কাল থেকে বয়লার আর জ্বলবে না।

এবার ফগ দুজন নাবিককে পাঠিয়ে দিল কেবিনের তালা খুলে কাপ্তেন স্পীডিকে বার করে আনবার জন্য।

ডেক-এর ওপরে উঠে এল একটা উন্মাদ। সে এল তর্জন আর অভিসম্পাত করতে করতে। এসেই তার প্রথম প্রশ্ন—"আমরা এখন কোথায় ?"

"লিভারপুল থেকে সাতশো সত্তর মাইল পশ্চিমে।"—অবিচলিতস্বরে ফগের উত্তর।

"দস্যু !"—গর্জে ওঠে আন্ডু স্পীডি।

"আপনাকে ডেকেছি এই কথা বলবার জন্য—"

"বোম্বেটে !"—দ্বিতীয় দফা গর্জন স্পীডির।

"এই কথা বলবার জন্য যে আপনি স্টীমারখানা এখনও বেচুন আমাকে।"

"কক্ষনো না। না-বেচার জন্য যদি আমার অনন্ত নরকবাস হয় তবুও না।"

"বেচলে ভাল করতেন, কারণ আমি স্টীমারখানা পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছি।"

"স্টীমার পুড়িয়ে ফেলতে?"—এ-ছাড়া আর কথা বেরুলো না স্তম্ভিত স্পীডির মুখ থেকে।

"অন্ততঃ স্টিমারের ওপরতলার কাঠের অংশটা। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে, অথচ কয়লা ফুরিয়েছে।"

"তাই বলে স্টীমারখানা পুড়িয়ে ফেলা? যার দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার?"—স্পীডির কথাগুলো আর স্পষ্টভাবে উচ্চারণ হচ্ছে না।

"পঞ্চাশ হাজার ডলার দাম? এই নিন ষাট হাজার।"—সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একতাড়া ব্যাঙ্কনোট ফগ এগিয়ে দিল স্পীডির দিকে।

আনড্রু স্পীডি থমকে গেল। গর্জনশীল সিংহ হঠাৎ মেষত্ব লাভ করে ব্যা-ব্যা করতে লাগল! অপমান, তালাবন্ধ হয়ে অবস্থান, ক্রোধ, ক্ষোভ সব ভুলে গেল এক নিমেষে। সে ভাবতে লাগল। স্টীমারখানা কুড়ি বছরের পুরানো। এখন ওর বদলে ষাট হাজার ডলার—আশাতীত দাম! কল্পনাতীত! ন্যায্য দামের অন্ততঃ দ্বিগুণ।

এতটা মুনাফা কি ছেড়ে দেওয়া যায়?

"নীচের লোহার অংশটা আমারই থাকবে তো?—তার স্বর অতি কোমল এখন।

"খোল এবং এঞ্জিন সব। কথা ঠিক তো?"

"ঠিক"—ফগের হাত থেকে নোটের তাড়াটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পকেটে পুরল।

পাসেপার্তুর মুখ কাগজের মত সাদা। রক্ত মাথায় উঠে ফিক্স অজ্ঞান হয়ে পড়ে বুঝি! ষাট হাজার ডলার দাম দেবার পরেও ফগ কিনা খোল এবং এঞ্জিনের ওপর দাবি রাখছে না? আরে, ওই লোহার অংশটাই তো দামী। কাঠের আবার দাম কী? ব্যাঙ্কের পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড তো তাহলে ফুরিয়েই এল।

ফগ তখন স্পীডিকে বলছে—"অবাক হবেন না মশাই, ২১শে ডিসেম্বর রাত্রি পৌনে নটায় লণ্ডনে উপস্থিত হতে না পারলে আমার বিশ হাজার পাউণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। অথচ 'চায়না' জাহাজ আমি ধরতে পারিনি এবং আপনিও আমাকে লিভারপুল নিয়ে যেতে রাজী হননি—"

"না হয়ে ভালই করেছিলাম দেখছি। সেই অস্বীকারের ফলে এখন আমি প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার মুনাফা করছি।"

চলেই যাচ্ছিল স্পীডি, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে স্পীডি বলল—"জানেন কাপ্তেন ফগ, আপনার স্বভাবটা মার্কিন-ঘেঁষা।"

খুব যেন বড় একটা প্রশংসা করা হয়েছে ফগকে, এইরকম ভাব দেখিয়ে স্পীডি নিজের কেবিনে চলে গেল।

কিন্তু কেবিন-টেবিন আর কতক্ষণ। ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গেল। বকশিশের আশ্বাস পেয়ে নাবিকেরা কুড়ুল নিয়ে সব কাঠের আসবাব কেটে নামাতে লাগল। কেবিন, রেলিং, মাস্তুল, পাটাতন রইল না কিছুই। ছোট ছোট টুকরোর আকারে সবই একে একে বয়লারে ঢুকতে লাগল। স্টীম কমতে পেল না।

২০শে তারিখ অমন সুদৃশ্য স্টীমারখানার অবশিষ্ট রইল শুধু নীচের খোলটা। যেন একখানা ভাসমান পল্টুন।

আয়ার্লাণ্ড দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু হায়, রাত যখন দশটা, তখন স্টীমার কুইন্সটাউনের সামনে! আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মত হাতে আছে ফিলিয়াস ফগের। লিভারপুল পৌঁছোতেই এই চব্বিশ ঘণ্টা সময় দরকার হবে, যদি পুরো স্টীম শেষ পর্যন্ত বজায় রাখা যায়। কিন্তু কাঠও আর নেই।

স্পীডির আর রাগ নেই। উলটে ফগের বাজির ব্যাপারটাতে সে কৌতূহল দেখাতে শুরু করেছে। সেই স্পীডি এসে বলছে—"মশাই, আপনার জন্য দুঃখ হয় আমার। এত করেও বাজিটা জিততে পারলেন না। এই সবে কুইন্সটাউন..."

সবজান্তা ফগ একটা খবর জানে না শুধু। সেইটিই জানতে চাইল স্পীডির কাছে—"কুইন্সটাউন বন্দরটা ছোট, জল গভীর নয়। এ-স্টীমার ঢুকতে পারবে?"

"জোয়ারের সময় পারবে, তার তিন ঘণ্টা দেরি এখনও।"

যার হাতে মোটে সময় নেই, সে শান্ত হয়ে তিন ঘণ্টা বসে রইল এই ছোট্ট বন্দরের বাইরে। নাবিকেরা ভাবল—ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র ফগই জানে যে বিরূপ ভাগ্যকে জয় করবার শেষ এই হাতিয়ার প্রয়োগ করতে হলে তিন ঘণ্টা তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ব্যাপারটা এই। কুইন্সটাউন থেকে বরাবর সমুদ্রপথে লিভারপুল যেতে সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা, কিন্তু কুইন্সটাউনে নেমে রেলপথে ডাবলিন গিয়ে সেখান থেকে দ্রুতগামী ডাকস্টীমারে লিভারপুল পৌঁছোতে বারো ঘণ্টার বেশী লাগে না। আমেরিকার সমস্ত ডাক ইংলণ্ডে পৌঁছোয় এই পথেই। বারো ঘণ্টা সময় বাঁচে এইভাবে।

এই বারো ঘণ্টা সময় ফিলিয়াস ফগও বাঁচাল।

২১শে ডিসেম্বর, দুপুর বারোটা বাজতে তখনও কুড়ি মিনিট বাকী। ফিলিয়াস ফগ সদলে লিভারপুলে পদার্পণ করল। এখান থেকে লণ্ডন যাওয়া মাত্র ছয় ঘণ্টার কাজ। বাজি জিত! বাজি জিত!

হঠাৎ --

একহাতে ওয়ারেণ্ট, ফিক্স এসে ফিলিয়াস ফগের কাঁধে অন্য হাত রাখল। "আপনি কি সত্যিই ফিলিয়াস ফগ?"

বিস্মিত, অসন্তুষ্ট ফগ বলল—"অবশ্য।"

"তাহলে আমি মহারানীর নামে আপনাকে গ্রেফতার করছি।"

* * * *

ব্যাপারটার পাশবিক নিষ্ঠুরতা এক মুহূর্তের জন্য যেন সকলেরই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত করে দিল। তারপর, পাসেপার্তু লাফিয়ে পড়ল ফিক্সের ঘাড়ে। কিন্তু পাঁচ ছয়টা পুলিশের লোক টেনে সরিয়ে দিল তাকে।

আউদা—সে থর থর করে কাঁপছে।

ওরা তখন শুল্ক আফিসে।

ফগকে নিয়ে আটক করা হল সেই আফিসের গুদামঘরে। এখানকার পুলিশের বড়কর্তার কাছে ছুটল ফিক্স। ফগকে লণ্ডন পাঠাবার বন্দোবস্ত করবার দায়িত্ব তাঁর।

আউদা আর পাসেপার্তু কাস্টম আফিসের বারান্দাতেই পড়ে আছে। পাসেপার্তু নিজেকে অভিসম্পাত করছে অনবরত। পরিতাপে দগ্ধ হচ্ছে

সে। সে কেন একথা প্রভুর কাছ থেকে গোপন রেখেছে যে এই ফিক্স লোকটা গোয়েন্দা এবং ইংরেজ রাজত্বে পদার্পণ-মাত্র ফগকে গ্রেফতার করবার জন্য সে ওয়ারেন্ট পকেটে নিয়ে নিয়ে ঘুরছে? ফগকে একথা জানালে তিনি নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার উপায় করতে পারতেন। প্রভু যে দস্যু নয়, এটা পাসেপার্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ তিনি অবশ্যই ফিক্সকে দিতে পারতেন, না পারলেও, অত বুদ্ধি যাঁর মাথায় খেলে, তিনি কি আর ফিক্সকে ফাঁকি দিতে পারতেন না? এই তো, হেনরিয়েটায় তাকে তুলে না নিলেই তো সে নিউইয়র্কে পড়ে থাকতে বাধ্য হত।

পাসেপার্তুর ক্রোধ ফিক্সের উপরে ততটা নয়, যতটা নিজের ওপরে। বিবেচনা করে দেখলে ফিক্স যা করেছে, তা কর্তব্য জেনেই করেছে। কিন্তু পাসেপার্তু? সে তার কর্তব্য করেনি, একশোবার—সে করেনি! করেনি! করেনি!

কেন করেনি? এ প্রশ্নের উত্তর পাসেপার্তু দিতে পারে না। ওই একটা বিষয়ে তার বিচারবুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে ছিল। ভবিতব্য ছাড়া আর কি!

* * *

গুদামঘরের ভেতরে একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আছে ফিলিয়াস ফগ। মুখে তেমনি অচঞ্চল প্রশান্তি। ঘড়িটা সামনে রয়েছে টেবিলের ওপরে। সেই ঘড়ির কাঁটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

নিশ্চেষ্ট? হ্যাঁ, চেষ্টা করবার কিছু নেই বলে। বাইরে থেকে দরজায় তালা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে একবার ঘরের ভেতরটা ঘুরে দেখে এসেছে। পালাবার পথ খুঁজবার জন্য কি? বোধ হয় তাই।

কিন্তু জানালায় মোটা মোটা লোহার গরাদে। পালানো অসম্ভব বুঝতে পেরে সে বেঞ্চের ওপর চুপ করে বসে আছে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। বারোটা বেজেছে সে কারারুদ্ধ হবার পরই। তারপর সাড়ে বারোটা বাজল, একটা বাজল। এখনও যদি ছাড়া পাওয়া যায়, অনায়াসে লণ্ডনে পৌঁছে নির্দিষ্ট সময়েই রিফর্ম ক্লাবে সে হাজির হতে পারে।

দেড়টা—দুটো। নিস্তব্ধ চারিধার। মাঝে মাঝে একটা কান্নার শব্দ শোনা যায় না কি? আউদা কাঁদছে, না, ফগের মনের ভুল?

আড়াইটা! তিনটা!—নাঃ, আর হল না। এখন ছাড়া পেলেও—

হঠাৎ একটা গোলমাল। ফগ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল না, কেবল দরজার দিকে ফিরে তাকাল মাত্র।

হুড়মুড় করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ফিক্স, পাসেপার্তু, আউদা। ফিক্স কাঁচুমাচু হয়ে তোতলার মত বলতে লাগল—"মহাশয়!—মিস্টার. ফগ—ক্ষমা—প্রচণ্ড ভুল—চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য—মানে আসল দস্যু তিন দিন আগে ধরা পড়েছে এডিনবরায়—আপনি মুক্ত।"

ফগ উঠে দাঁড়িয়েছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে দুই হাত দিয়ে যুগপৎ দুই ঘুষি বসিয়ে দিল ফিক্সের মুখে। ফিক্স গড়িয়ে পড়ে গেল।

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে রেল-স্টেশনে ছুটল ফগ। কোন গাড়ি নেই। স্পেশাল ট্রেন পাওয়া যায়? যাবে, তিন কোয়ার্টার বাদে।

স্পেশাল ট্রেন, এঞ্জিনিয়ারকে বকশিশের লোভ দেখানো সত্ত্বেও, সেই স্পেশাল ট্রেন যখন লণ্ডন পৌঁছালো, তখন স্টেশনের ঘড়িতে নয়টা বাজতে দশ মিনিট।

মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য বাজিতে হেরেছে ফিলিয়াস ফগ।

* * *

স্যাভাইল রো'র বাড়িতে ঢুকেই পাসেপার্তু'র প্রথম কাজ হল গ্যাস নিবিয়ে দেওয়া। আশি দিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলেছে এই গ্যাস এবং এই জ্বলুনির খরচ পাসেপার্তু'র মাইনে থেকেই উশুল হবে।

কিন্তু সে দুশ্চিন্তা এখন করছে না সে। তার মনে ওর চেয়েও ভয়ানক দুশ্চিন্তা এখন। সর্বস্বান্ত হয়ে তার প্রভু এখন আত্মহত্যা না করে।

স্যাভাইল রো'র বাড়িতে একটাও জানালা খোলা হয়নি। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না যে বাড়ির মালিক ফিরে এসেছে।

২১শে তারিখ ফিলিয়াস ফগ সারাদিন নিজের ঘরে হিসাবপত্র নিয়ে কাটাল। সন্ধ্যাবেলায় আউদাকে বলে পাঠাল সে একবার দেখা করতে চায়।

দেখা হল। বিনা ভূমিকায় ফগ বলল—"মিসেস আউদা। আপনাকে যখন ইউরোপে আসবার পরামর্শ দিয়েছিলাম, তখন আমি ধনী ছিলাম। তখন আশা ছিল—ইউরোপে যাতে আপনি সুখে জীবন কাটাতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারব। আজ সে-আশা আর নেই আমার। ভ্রমণের ব্যয় এবং এই বাজিটা হেরে যাওয়া—দুইয়ে মিলে আমাকে দরিদ্র

করে রেখে গিয়েছে। তবু যা সামান্য কিছু আছে, আপনাকে আমি দিয়ে দিতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো ?"

আউদা অতিমাত্র বিবর্ণমুখে চুপ করে সব কথা শুনল। তারপর বলল —"এখনও যা-কিছু আছে, তা আমাকে দিয়ে দিতে চাইছেন। তাহলে আপনার নিজের কী হবে ?"

"আমার নিজের কিছু চাই না" নিঃস্পৃহকণ্ঠে ফগের জবাব।

"হয়ত আপনার আত্মীয়েরা সাহায্য করবেন বা বন্ধুরা ?"—আউদা কি ফগকে উত্তেজিত করবার জন্যই এ কথা বলল ? তা না হলে ফগ যে কারও সাহায্য নেবার পাত্র নয়—এটা কি আউদার মত বুদ্ধিমতী নারীর এখনও বুঝতে বাকী আছে ?

"আমার আত্মীয় বা বন্ধু কেউই নেই।" ফগের কণ্ঠ বিরস।

আউদা উঠে দাঁড়াল—এক পা এগিয়ে এসে একটা আশ্চর্য রকমের দৃষ্টি ফগের মুখের উপর বিন্যস্ত করে সে বলল—"একাধারে আত্মীয় এবং বন্ধু যদি একজন পান, তাকে আপনি গ্রহণ করবেন কি ? আমায় বিবাহ করবেন আপনি ?"

"পাসেপার্তু ! পাসেপার্তু !"

প্রভুর জোরগলার আহ্বান শুনে পড়ি-কি-মরি ছুটে এল পাসেপার্তু।

"মেরি-লি-বন পল্লীর পাদরি স্যামুয়েল উইলসনকে এখনই খবরটা দিয়ে আসতে পারবে ? বিবাহ কাল।"—আউদার মুখের দিকে তাকিয়ে ফগ জিজ্ঞাসা করল—"কেমন ? কালই তো ?"

লজ্জারুণা আউদা বলল—"কালই।"

পাসেপার্তুকে আর দ্বিতীয়বার কিছু বলতে হল না। আটটা পাঁচ এখন। এর পর আর পাদরির দেখা না পাওয়া যেতে পারে। সে ছুটল।

আধ ঘণ্টা বাদে সে ফিরে এল—দ্বিগুণ বেগে ছুটতে ছুটতে। "কাল বিবাহ হতে পারে না। কাল রবিবার।"

"কাল রবিবার ?" ফগ চমকে উঠল "রবিবার আজ। জানো না, কাল শনিবার ছিল ? ২১শে ডিসেম্বর, শনিবার আমার সর্বনাশের তারিখ।"

"ভুল ! ভুল ! শনিবার ২১শে ডিসেম্বর আজই কিন্তু আর দশ মিনিটও সময় নেই।"

হিসাবের একটা মোটা ভুল। বরাবর পুব মুখে যেতে যেতে ফিলিয়াস ফগ প্রতি ডিগ্রীতে চার মিনিট বাঁচিয়েছে। মোট পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ ডিগ্রীতে বিভক্ত। সবটা ঘুরে আসতে কাজেই ফগ পুরো চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ একটা দিনই নিজের অজান্তে বাঁচিয়ে ফেলেছে তার হিসাবে যেটা দাঁড়িয়েছে ২১ শে ডিসেম্বর লণ্ডনের লোকের হিসাবে সেটা ২২শে মাত্র।

প্রভুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনল পাসেপার্তু, একখানা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দিল তাঁকে, নিজে উঠে বসল পাশে। "একশো পাউণ্ড বকশিশ ড্রাইভার, যদি পাঁচ মিনিটে পল মল পৌঁছুতে পার"—এ ঘোষণা ফগের নয়, পাসেপার্তুর।

তিনটে কুকুরছানা চাপা পড়ল, পাঁচখানা গাড়ির সঙ্গে ঠোকাঠুকি হল রাস্তায়।

* * *

রিফর্ম ক্লাবের সেই ঘরে ফ্লানাগান, ফ্যালেন্টিন, সালিভান, স্টুয়ার্ট আর গথিয়ার র‍্যাল্‌ফ তাদের টেবিলে বসে আছে। আজ ২১শে ডিসেম্বর, শনিবার। আজ রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে ফিলিয়াস ফগ যদি এখানে উপস্থিত না হয়, বেরিং ব্রাদার্সের ব্যাঙ্কে তার গচ্ছিত বিশ হাজার পাউণ্ড বিনা ওজরে তাদের হয়ে যাবে। এক একজনে লাভ করবে চার হাজার পাউণ্ড। সাড়ে আট বেজে গিয়েছে, এখনও আসেনি ফিলিয়াস ফগ।

বস্তুতঃ সে আসবে, এমন আশা কেউ করে না। চায়না স্টীমার ১৭ই পৌঁছে গেছে, তার যাত্রীতালিকায় ফিলিয়াস ফগের নাম ছিল না। স্যাভাইল রো'তে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে—ফগের বাড়ির দরজা জানালা পূর্ববৎ বন্ধ।

কিন্তু তবু উৎকণ্ঠার শেষ নেই এদের। শেষ হবে ৮ টা ৪৫ মিনিট পেরিয়ে গেলে।

ওদিকে ক্লাবের বিস্তীর্ণ হাতা লোকে লোকারণ্য। এ সব লোক বাজি ধরেছে ফিলিয়াস ফগের ওপর। বাজি ধরাধরিতে মন্দা পড়েছিল মাঝখানে

ফগের নামে ওয়ারেণ্ট জারি হওয়ায়। কিন্তু চার দিন আগে আসল ব্যাঙ্কদস্যু যখন ধরা পড়ল এডিনবরায়, বাজির বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠল আবার। বাজিতে কে হারে কে জেতে, চাক্ষুষ দেখবার জন্য সবাই রিফর্ম ক্লাবের হাতায় হাজির আছে এই সন্ধ্যায়।

আটটা চল্লিশ বেজে গিয়েছে। তাস নাড়াচাড়া করে সবাই একটা অলীক নিশ্চিন্ততার ভান করছে বটে, কিন্তু তাদের মুখ দেখলে এবং ছাড়া-ছাড়া কথা শুনলেই বোঝা যায় যে সেটা তাদের ভানমাত্রই।

আটটা একচল্লিশ। বেয়াল্লিশ। তেতাল্লিশ। মুখে হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা সবাইয়ের। তেতাল্লিশ পেরিয়েছে এখনও কোনও চিহ্ন নেই ফিলিয়াস ফগের। নিশ্চয়ই গথিয়ার র‍্যাল্ফ্‌দের মুখে হাসি ফোটা উচিত এখন! কিন্তু ফুটছে না তবু।

চুয়াল্লিশ। বাইরে একটা হল্লা শোনা যায় যেন। কিন্তু সে দিকে কে কান দেয়? রাস্তায় হয়ত দুর্ঘটনা ঘটেছে কিছু! ঘড়ি! ঘড়ির দিকে স্থির দৃষ্টি সকলের। এক মিনিট আর!

দশ সেকেণ্ড গেল। গেল বিশ সেকেণ্ড! বাইরের গোলমালটা আরও বেশী হয়ে আরও নিকটে এসেছে যেন! তা আসুক। ফিলিয়াস ফগ তো আসেনি!

ত্রিশ সেকেণ্ড! চল্লিশ! পঞ্চাশ! না, ফগ আসেনি। সবাই তাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘড়িটাকে গিলবে যেন, এমনি ভাবে তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে।

একান্ন! পঞ্চান্ন! সাতান্ন! সিঁড়িতে এত লোকের পায়ের শব্দ কেন? এত লোকে চেঁচায় বা কেন? কী বলছে? ফগ?

ফগ? ফগ? ফগ?

ষাট সেকেণ্ড পূর্ণ হবার আগে হলের দরজা ঘড়াং করে খুলে গেল। এক পরিচিত কণ্ঠ বলে উঠল—

"বন্ধুগণ! আমি এসেছি—।"

* * *

আউদার সঙ্গে ফগের বিবাহ আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেই হল। সেদিন পাসেপার্তুর রাজকীয় মহিমা।

বাজি জিতে আনন্দ এবং গৌরব লাভ করা গেল বটে, কিন্তু আর্থিক সুবিধা কিছু হল না বিশেষ। কারণ বিশ হাজার পাউণ্ড লাভ করতে ফগকে খরচ করতে হয়েছে উনিশ হাজার। বাকী যে এক হাজার রইল, সেটা সে সমান ভাগে ভাগ করে দিল ভৃত্য পাসেপার্তুকে এবং—এবং—এবং গোয়েন্দা ফিক্সকে।

না, ফিক্সের ওপর তার রাগ নেই কিছু।

—সমাপ্ত—



